বাংলাদেশের নির্বাচিত ছোটদের হাসির গল্প

দ্বিতীয় খণ্ড

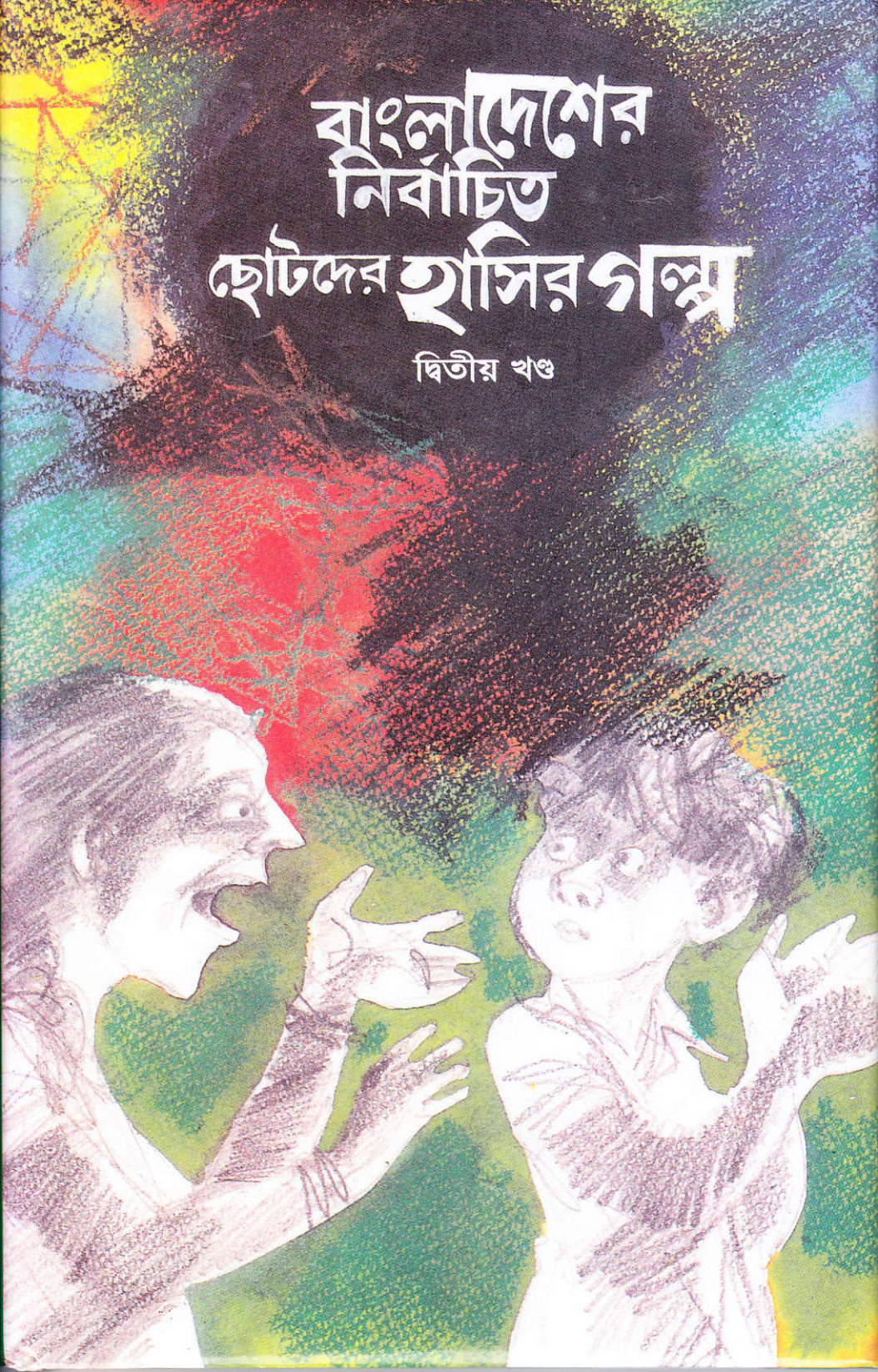

আলোকিত মানুষ চাই

বাংলাদেশের নির্বাচিত ছোটদের হাসির গল্প

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা
আমীরুল ইসলাম
আহমাদ মাযহার

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
অন্তর্ভুক্তি নং:
পরিবেশনে: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
SEQAEP

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৬

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬ জুন ১৯৮৯

চতুর্থ সংস্করণ নবম মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অলঙ্করণ
সৈয়দ এনায়েত হোসেন

মূল্য
আশি টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0015-2

সূচি

মরহুম ভাইয়ের কাহিনী ॥ শওকত আলী ৯

হেমাপ্যাথি, এ্যালাপ্যাথি ॥ হাসান আজিজুল হক ১৯

ফেলুমামার কবলে ছেলেধরা ॥ নিয়ামত হোসেন ২৬

সদাচার সমাচার ॥ মাহবুব তালুকদার ৩৪

কুড়ানো টাকার কুরুক্ষেত্র ॥ ইমরুল চৌধুরী ৪১

প্রফেসর বিভ্রাট ও ফটোজ্যান্তপ্রপঞ্চ ॥ বিপ্লব দাশ ৪৬

কেমন জব্দ ॥ খান মোহাম্মদ ফারাবী ৫৯

গত চার দশকে বাংলাদেশের সাহিত্যিকগণ শিশুকিশোরদের জন্যে যেসব হাসির গল্প রচনা করেছেন তারই একটি প্রতিনিধিত্বশীল সংকলন উপহার দেয়ার উদ্দেশ্যে *বাংলাদেশের নির্বাচিত ছোটদের হাসির গল্প* প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হল। দুই খণ্ডে প্রকাশিত এই সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডে গত চার দশকের প্রবীণ ও নবীন লেখকদের রচনা সংকলিত হয়েছে।

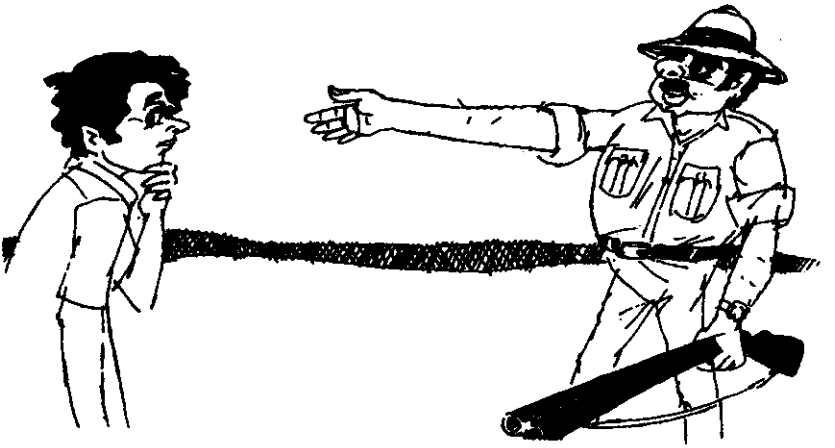

মরহুম ভাইয়ের কাহিনী

শওকত আলী

মহরম ভাইকে তোমরা কেউ দেখেনি। অমন শহুরে মানুষ খুব কম দেখেছি আমি। কথাবার্তা চালচলনে সর্বক্ষণ নিজের শহুরেপনা জাহির করেন। তাঁকে দেখে আমরা গাঁয়ের ছেলেরা সবাই হা হয়ে যেতাম।

মহরম ভাইয়ের অনেক কাহিনী আছে। অনেকবার তিনি আমাদের গাঁয়ে অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন। আর প্রত্যেকবারেই বিফল হয়ে ফিরে গিয়েছেন। তাঁর বিফলতার জন্য কেউ দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছি আমরাই। গাঁয়ের অসভ্য জঙ্গল, মূর্খ মানুষ, অর্থহীন খোলা মাঠ, নদীনালা—এই সবই তাঁর ব্যর্থতার কারণ। সেইজন্যে তিনি ভারি দুঃখ করতেন। কিন্তু আমরা কী করতে পারি তাঁর মতো প্রতিভা, ভদ্রলোকের শহুরে প্রতিভা, কাজে লাগাবার মতো যোগ্যতা তো আমাদের এখনো হয়ে ওঠেনি। দোষ দেব কাকে?

মহরম ভাইকে যে তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব--সে উপায়ও এখন আর নেই। মনের দুঃখে ভদ্রলোক কামস্কাটকা না হনলুলু চলে গেছেন। যাওয়ার সময় ভারি দুঃখ করে বলে গেছেন, এদেশের কিচ্ছু হবে না। এদেশের উন্নতি হতে এখনো অনেক দেরি।

যাক্ সে কথা। মহরম ভাই প্রথম যেবার এসেছিলেন সেইবারের গল্প বলছি। গল্প নয়, কিছুটা অ্যাডভেঞ্চার। বড় কষ্টের, বড় দুঃখের সে অ্যাডভেঞ্চার।

মহরম ভাই সেবার এসে জানালেন বাঘ শিকার করবেন। শিকারের সাজ-সরঞ্জাম সব নিয়ে এসেছেন। আমাকে ডেকে বলেন, 'দ্যাখ্ সতু, আমাকে জনকয়েক খুব সাহসী আর শক্তিমান সঙ্গী জোগাড় করে এনে দে। আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। এর জন্যে পয়সা দেব ওদের। কিন্তু দেখেশুনে আনবি; লম্বাচওড়া, ইয়া বুকের পাটা, মস্ত গোঁফ, দশাসই চেহারা যেন হয়।'

আমি ভাবনায় পড়লাম। কাকে দিই? অমন মানুষ কি আছে? সব মেলে; সাহস, শক্তি, দশাসই চেহারা—সব পাওয়া যাবে হয়তো, কিন্তু ঐ গোঁফ,—মোটা কালো ভয়-দেখানো গোঁফ কোথায় পাব? সারা গাঁয়ের জোয়ান ছেলেদের কথা স্মরণ করলাম; কিন্তু না—গোঁফওয়ালা, ঐরকম মস্ত মোটা কালো গোঁফওয়ালা মানুষ কেউ নেই।

সারাদিন ভেবেচিন্তে বিকেলবেলা মাথা চুল্‌কে জানালাম, 'মহরম ভাই, পাওয়া যাবে না।'

'সে কিরে, এ্যাঁ।' মহরম ভাই আশ্চর্য হলেন, 'শক্তসমর্থ মানুষ পর্যন্ত নেই তোদের গাঁয়ে! কী আশ্চর্য, তোরা বেঁচে আছিস কেমন করে, যদি ডাকাত পড়ে? যদি আগুন লাগে? যদি ভূমিকম্প হয়? তাহলে তোদের বাঁচাবে কে? এ্যাঁ, কে সাহায্য করবে?'

মহরম ভাইকে হতাশ দেখে আমি অতিকষ্টে বললাম, 'আপনি যেমন বললেন ঠিক তেমনটি না হলে অবশ্যি...' এ পর্যন্ত বলে থামলাম। দেখে নিলাম মহরম ভাইয়ের মুখে কোনো ভাবান্তর হয় কি না।

মহরম ভাই, আমার চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞে করলেন, 'থামলি কেন, বল্, তেমনটি না হলে কী?'

'পাওয়া যায়,' কথাটা শেষ করলাম।

'পাওয়া যায়, তা পাওয়া গেলে আন্‌ছিস না কেন?' অসহিষ্ণু হয়ে দুপা এগিয়ে এলেন। 'যা, শিগগির যা, নিয়ে আয়।'

'কিন্তু', তখন আরেকবার মাথা চুলকোলাম আমি।

'কিন্তু কী?'

'ঐ যে গোঁফ?'

'গোঁফ কী?'

'ওদের কারো মোটা গোঁফ নেই।'

'গোঁফ নেই।' মহরম ভাই কী যেন ভাবলেন। বোধয় হতাশ হলেন। তারপর বললেন, 'গোঁফ যদি না থাকে তাহলে তাই নিয়ে আয়। কী করবি, সবাই কি আর গোঁফের মর্ম জানে। তোরা তো গাঁয়ের মানুষ, তোরা কি বুঝবি গোঁফের কী গুণ!'

আরো হয়তো কিছু বলতেন। আমি না-শুনেই ছুটে গেলাম মাখন-ছানা-দৈ-এর উদ্দেশ্যে। সাহসী মানুষ বলতে, জোরওয়ালা মানুষ বলতে ঐ তিন ভাই। এমনি

দুঃসাহসী কাজে ওদের ছাড়া অন্য কারো কথা মনেই আসতে পারে না। ওদের মতো গোঁয়ার ছেলে আর নেই দু-তিন গাঁয়ে। তবে একটুখানি দোষও ধরে দুষ্টু লোক। বলে, ওরা নাকি ভীষণ বদরাগী। একটুতেই দারুণ চটে যায়। চটে গেলে আর রক্ষে নেই। একটা কিছু না করে থামবে না।

ওই একটি দোষ। তা মানুষ কি আর সর্বগুণের অধিকারী হতে পারে? হাজার হলেও মানুষই তো! দোষগুণ মিলিয়েই তো মানুষ।

ওদের তিন ভাইয়ের ইন্টারভিউ হবে। সেই সন্ধেবেলা। বারান্দায় বেঞ্চের ওপর বসে রয়েছে ওরা। মহরম ভাই বেরুবেন, বেরিয়ে এসে ওদের সঙ্গে আলাপ করবেন।

একসময় মহরম ভাই বেরুলেন। আমি বললাম, 'ভাই, এই যে এরা এসেছে, যাদের কথা বলছিলাম তখন। এরাই তিন ভাই।'

'কী নাম তোর?' মাখনের দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মহরম ভাই।

মাখন মাথা নিচু করে বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'জি, আমার নাম মাখন।'

'আর তোর?' ছানার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন হল।

'জি, আমি ছানা।'

'তোর?'

'জি, দৈ।'

মহরম ভাই গম্ভীর হয়ে গেলেন। একবার চোখ ঘোঁচ করে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'যাহ্ এসব কি আর নাম হল? ভালো দেখে নামও রাখতে পারে নি তোদের বাবা-মা? তোরা গাঁয়ের মানুষগুলো কী, এঁ্যা!'

আমি তখন বিপদে পড়ে গিয়েছি। কী করব বুঝতে পারছি না। প্রথম সাক্ষাতেই এ অবস্থা কে ভেবেছিল। মহরম ভাই বলে কী! বাপ-মা তুলে গালাগাল। তিন ভাইতে মিলে শুরু করলে আমাদের দুজনকেই তো এক্ষুনি তুলো ধুনে ছেড়ে দেবে। ধুনো তুলোর যেমন ফেঁসো বেরিয়ে যায়, ওদের তিন ভাইয়ের মারের চোটে তেমনি দুজনের শরীর থেকেই ফেঁসো বেরিয়ে যাবে। আমি মহরম ভাইকে থামাতে চেষ্টা করি। আগ বাড়িয়ে বলি, 'এই নামই ওদের পছন্দ মহরম ভাই। বাপ-মায়ের দেয়া নাম, তাছাড়া নামে কী যায় আসে বলুন? হোয়াট ইজ ইন এ নেম?' আমি কিছুটা বক্তৃতা করতে চেষ্টা করি।

মহরম ভাই বিরক্ত হলেন। বললেন, 'থাম্ তুই। তুই কী বুঝিস এসবের? এটা নাম হল? খাদ্যবস্তুর নামে কি মানুষের নাম হয়? তাহলে মানুষের নাম আর খাদ্যবস্তুতে পার্থক্যটা থাকল কোথায়? তোরা গাঁয়ের মানুষগুলো কি মানুষ, গরু, মুলো, কাঁচকলার মধ্যে কোনো তফাৎই দেখতে পাস না?'

মহরম ভাই পায়চারি করলেন দুবার। সখেদে বললেন, 'না, কিচ্ছু হবে না এদেশের। আমি বলে দিলাম তোরা লিখে রাখ্, একশো বছরেও কিছু হবে না। মানুষের নাম রাখতে জানে না। হরিব্‌ল্!'

একটু থেমে বললেন, 'হত আমাদের ঢাকার ছেলে, তাহলে বাপ-মাদের এই মুখ্যুমি সোজা করে দিত। হ্যাঁ, নিজেই খবরের কাগজে লিখে জানিয়ে দিত—তার পছন্দ করা নাম কী।'

তারপর মুখোমুখি তাকিয়ে বললেন, 'দ্যাখ্ না, আমাকে দ্যাখ্, আমিই কি পুরনো নামটা চালু রেখেছি নাকি?'

'বাহ্, রাখেননি তাহলে?' আমি অবাক হই।

'আচ্ছা সে হবে পরে।' মহরম ভাই নাম-প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আসল কথা পাড়লেন, 'তোমাদের খুব সাহস আছে তো, না শেয়াল দেখেই দৌড়বে?'

মহরম ভাইয়ের কথায় সবাই হেসে ফেললাম। মহরম ভাই দৈ-এর ঘাড়ে চাপড় মেরে বললেন, 'কিরে গায়ে জোরটোর আছে, না শুধু দেখতেই কুমড়োপটাশ।'

আমি আরেকবার চমকে উঠলাম। মহরম ভাই কাকে কী বলছে! একটা খুনোখুনি না হয়ে যায়! আমি আল্লা আল্লা করতে আরম্ভ করে দিয়েছি তখন। কেন আনলাম এদের।

মহরম ভাইয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললাম, 'ওসব কিচ্ছু দেখতে হবে না মহরম ভাই। ওদের দারুণ সাহস, এই সেদিন একটা পাগলা মোষ পিটিয়ে শায়েস্তা করে দিয়েছে।'

'তাই নাকি, গুড।' হাসি ফুটল মহরম ভাইয়ের মুখে। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

মহরম ভাই চোখ সরু করে ওদের দেখছেন তখনও। যেন পরখ করছেন। দু-চার পা পায়চারি করলেন। তারপর বললেন, 'তোমরা আমার সঙ্গে যেতে রাজি আছ তো?' একটু থেমে আবার বললেন, 'খুব বিপজ্জনক কাজ, বাঘ-শিকার তো আর হেলাফেলা কাজ নয়, গরুমোষ তাড়ানোর মতো ব্যাপার নয়।'

ওরা তিন ভাই এ-ওর মুখের দিকে তাকাল। আমার দিকে তাকাতে আমিই বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ ভাই, সব বলেছি ওদের। ওরা সব শুনেই রাজি হয়েছে।'

'বাহ্ এই তো চাই।' মহরম ভাই সত্যি সত্যিই খুশি হলেন এবার। বললেন, 'না থাকলে মানুষ বীর হবে কেমন করে? আমাদের সাহস না-থাকার জন্যই তো এমনি অধঃপতন।'

মহরম ভাই হঠাৎ আবার বলে উঠলেন, খেদের সঙ্গেই বলে উঠলেন, 'কিন্তু ভাই এটা কী ধরনের নাম তোমাদের?'

আবার নাম-প্রসঙ্গ! তিন ভাই ভীষণ চটা এ-ব্যাপারে। নাম নিয়ে হাসিঠাট্টা করলে কিছুতেই স্থির থাকতে চায় না।

'এটা কি নাম হল, এ্যাঁ! মহরম ভাই আবার বললেন, এ নামের কোনো মানে হয়?'

দেখতে পাচ্ছি ওরা তিন ভাই কেমন অস্থির হয়ে উঠেছে। এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে। বুঝলাম, এবার আরম্ভ হয়ে যাবে।

আমি গেটটা খোলা আছে কি না দেখে বললাম, হ্যাঁ, মরিয়া হয়েই বললাম, 'ভাই, নাম দিয়ে কী দরকার? মানুষটা পেলেই হল। নামটা তো ডাকবার জন্য শুধু। যে-কোনো একটা নাম হলেই হল।'

'হুঃ' মহরম ভাই রেগে উঠলেন। 'এই বুদ্ধি না হলে গাঁয়ে বাস করতিস। যত গণ্ডমূর্খর দল। যে-কোনো নাম হলেই হল! মানুষকে ডাকবে কুকুর বলে, কুকুরকে মানুষ। বুড়োমানুষরা, সেই আদ্যিকালের বিচারে কী একটা নাম ঠিক করে রেখেছে সেটাই চলবে! পুরনো টাকা চলে না, পুরনো কাপড় চলে না, আর পুরনো নাম চলবে?'

'বাহ্, চলবে বা?' আমি তখন সোৎসাহে তর্ক করতে আরম্ভ করেছি। মাখন-ছানা-দৈ আমার কথায় খুশি হয়েছে বলে মনে হল। বললাম, 'ভাবুন দিকি আপনার বাবা-মা কত সাধ করে নাম রেখেছেন, কত ধার্মিক ছিলেন তাঁরা—কত সুন্দর নাম রেখেছেন আপনার।' আমি বেশ ভাব নিয়ে, গলায় দরদ ঢেলে, বুঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু বৃথা।

মহরম ভাই আরো চটে উঠলেন, 'বাজে বকিসনি, কী জানিস তুই দুনিয়ার? আমার নাম রেখেছিলেন মহরম আলী। কিন্তু এর কি কোনো মানে হয়? কিস্‌সু মানে হয় না। শুনতেও কানে খারাপ লাগে।'

'বাহ্, মানে হয় না?' আমি তখন জোর করে বলে উঠলাম, 'মুসলমানদের কত বড় পর্ব এটা— ত্যাগ, বীরত্ব, ধর্মনিষ্ঠা, কত কিছু রয়েছে এ নামের সঙ্গে জড়িয়ে।'

'যা, যা!' মহরম ভাই ধমকে উঠলেন, 'যা জানিস না সে-বিষয়ে কথা বলবি না। মহরম হল একটা মাসের নাম, হ্যাঁ আরবি মাসের নাম। বাংলাদেশে কেউ কি ছেলের নাম রাখে বৈশাখ, আষাঢ়, চৈত্র? তোর নাম যদি কেউ দেয় অগ্রহায়ণ, তোর কেমন লাগবে?'

'বাহ্ শুধু কি মাসের নাম...' আমি আরো কিছু বলতাম। মহরম ভাই থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আর যা বলবি তাও তো জানি। মহরম পর্বের সে ঘটনাটা কী, জানিস তো, না এমনিই ফ্যাঁচফ্যাঁচ করছিস। ঘটনাটা তো সেই হেরে যাওয়ার ব্যাপার। পরাজয়ের গ্লানি।'

আমি চুপ হয়ে গেলাম। সত্যিই তো মহরম পালন যে আমরা করি সে তো ঐ ইমাম হোসেনের জন্যে। মাসটা তো কিছু নয়। বরং ঐ মাসটাই তো অলক্ষুনে। ঐ মাসটা যদি ভালো হত তাহলে কি আর ইমাম হোসেন যুদ্ধে হেরে যান! আমি চুপ করে গেলাম। সত্যি মহরম ভাইয়ের কী বুদ্ধি! আমি শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে পড়লাম।

'আর সেইসব ভেবেই তো আমি নাম বদলালাম,' মহরম ভাই সগর্বে বললেন। 'এই মডার্ন যুগের নামও যদি মডার্ন না হল, তাহলে এ যুগে বাঁচার সার্থকতা কোথায়?'

'কী নাম নিলেন?'—মাখন কৌতূহলী হল!

'সবাইকে বলে দিলাম, মহরম নয়, আমার নাম মরহুম।'

'মানে!' আমি হোঁচট খেলাম যেন।

'মানে, যে পুণ্যাত্মা হয়েছে।' মহরম ভাই, থুড়ি মরহুম ভাই ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, 'মরে যে পুণ্যাত্মা হয়েছে তারই নাম মরহুম। অতি মহৎ ভাব এর মধ্যে, তোরা বুঝবি না, তাছাড়া নামটার মধ্যে কেমন সুন্দর মোলায়েম একটা মিউজিক আছে।' আমাদের দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে বললেন, 'নাহ্ সেও তোরা বুঝবি না, থাকতিস ঢাকায়, তাহলে বুঝতিস।'

আমি স্বীকার করি। নিরুপায় হয়েই স্বীকার করি। কেননা কায়েদে আজমের মৃত্যুর পর, তাঁর নামের আগে মরহুম লেখা হয়। লিয়াকত আলী মরে যাওয়ার পর, তাঁরও নামের আগে মরহুম লেখা হয়। সম্মাননীয় ব্যক্তি মরলে সবার নামের আগেই ঐ 'মরহুম' শব্দটা ব্যবহার করা হয়। তাহলে তাই হবে। মহরম ভাইয়ের কথাই ঠিক। অতি মহৎ ভাব মহরম অর্থাৎ মরহুম ভাইয়ের নামের মধ্যে। আহা, নামের কী মহিমা!

দৈ, ছানা, মাখনের নাম নিয়ে আপত্তি থাকলেও শেষপর্যন্ত মহরম ভাই ওদেরকেই সঙ্গী ঠিক করলেন। আমার কিন্তু এখনও ভয় যায়নি। কে জানে আবার কখন কী বলে ওদের তিন ভাইকে খেপিয়ে তোলেন। এক যাত্রা তো বাঁচলাম। মহরম ভাইয়ের কী! তিনি তো ঢাকার ছেলে ঢাকায় ফিরে চলে যাবেন, আর শহরে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াবেন। তাঁকে তো আর দৈ, ছানা, মাখন হাতের কাছে পাবে না। পাবে তো আমাকে। আর আমাকে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাবে তখন।

একদিন রাতে আফসোস করে বললেন মহরম ভাই, 'ওদের একজনেরও যদি গোঁফ থাকত!'

এই কথাটাই ভয়ের। নাম নিয়ে টানাটানিতে কিছু হয়নি। কিন্তু এবার গোঁফ নিয়ে টানাটানি করলে আর রক্ষে থাকবে না।

দুটো দিন গেল আয়োজন করতে করতে। কোথায় যাওয়া যাবে, কোথায় বাঘ পাওয়া যাবে, গাইড কে হবে, এইসব খোঁজখবর হল। কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করতে পারছেন না মহরম ভাই।

মস্ত আয়োজন মহরম ভাইয়ের। দেখেই মনে হয়—হ্যাঁ শিকারি বটে। একদিন তিনি শিকারের সাজ পরে বন্দুক বাগিয়ে ধরে দেখালেন। কীভাবে দাঁড়াতে হয়, কতদূর থেকে তাক করতে হয়, জানোয়ারের কানের পাশে মারতে হলে কী উপায়ে বিদ্যুৎগতিতে পাশ ফিরতে হয়, দুচোখের মাঝখানে লক্ষ্যভেদ করতে হলে কী

পজিশনে দাঁড়াতে হয়, পাশ থেকে বুকে মারতে হলে বন্দুক কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তুলতে হয়—পুরোপুরি একটা রিহার্সেলই দেখালেন। আমরা দেখে বললাম, 'হ্যাঁ, এর নামই শিকার।'

মহরম ভাই আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জিম করবেটের নাম শুনেছিস?'

আমরা মাথা নাড়লাম।

মহরম ভাই বিরক্ত হলেন, 'যাহ্, তোরা দেখছি কিচ্ছু জানিস না। জিম করবেট দুনিয়ার বিখ্যাত শিকারি। 'ম্যান্ ইটারস্ অফ কুমায়ূন' বই লিখেছেন। আমি যে প্রাকটিস দেখালাম সে তো ঐ বই পড়ে শেখা। তোরা কী বুঝবি?'

সত্যি তো আমরা কী বুঝব। মহরম ভাইয়ের ওপর শ্রদ্ধা চারগুণ বেড়ে গেল।

'এখন একটা বাঘ পেলে হয় কোথাও', আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঐ ওদিকের জঙ্গলে নেই?'

আমি বললাম, 'কী?'

আরো বিরক্ত হলেন মহরম ভাই। 'কী আবার, বাঘ।'

আমরা মাথা নাড়লাম, 'না-বাঘ নেই ও-জঙ্গলে।'

'যাহ্ কীরকম তোদের গ্রাম, এ্যাঁ। জঙ্গলে একটা বাঘ নেই, তোদের কোনো উন্নতি নেই, সত্যি, দেখিস। রবীন্দ্রনাথ কী ভুলেই যে লিখেছিলেন : বাঘের সাথে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।'

আমি বলতে গেলাম, 'ওটা তো সত্যেন দত্তের...'

'যা, যা,' খেঁকিয়ে উঠলেন মহরম ভাই, 'আমার চেয়ে বেশি জানিস? আমি হলাম গিয়ে গিরীশ ঠাকুরের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের নাতি গিরীশবাবু বলেছেন আমাকে। আর উনি এলেন কি-না এক দত্তের নাম নিয়ে।'

আমি চুপ করে গেলাম। কে জানে হতেও পারে, মহরম ভাই বললেন যখন।

শিকারে যাত্রার আয়োজন করি। এবার শুধু যাত্রা বাকি।

আর কী সৌভাগ্য—শোনা গেল পাশের গ্রামের জঙ্গলে বাঘ এসেছে। রাতে ফেউ ডাকছে, রাস্তাঘাটে বোঁটকা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। মাঠ থেকে দড়িদড়া ছিঁড়ে গরুর পাল গোয়ালে ছুটে এসেছে। এসব খবর এল একের-পর-এক।

সুতরাং আর দেরি নয়। মহরম ভাই আমাকে ছাড়বেন না। মাখন, ছানা, দৈ-কে জুটিয়ে দিলাম তাতে হল না, আমাকেও নেবেন সঙ্গে। আমি যত বলি, আমি পারব না, মিছেমিছে ঝামেলা বাড়াব, আমার কাজ আছে, সামনে পরীক্ষা—মহরম ভাই ততই বলেন, আর কিছুটা সাহস বাড়া। সাহস না বাড়ালে জীবনে সাইন করবি কেমন করে? সাহস নেই বলেই তো এদেশের এমনি অধঃপতন। শুধু পরীক্ষা দিয়ে কী আর উন্নতি হয়?

আমি রাজি নই দেখে গালাগালি দিতে লাগলেন। বললেন, 'তুই ভিতু, কাপুরুষ, কেন যে মেয়ে হয়ে জন্মাসনি! তোর মতো ভিতুর সঙ্গে আমার কথাই বলা উচিত নয়।'

এতসব গালাগাল শুনে ভেতরে ভেতরে রেগে গেলাম। জেদ হল সুতরাং আমিও যেতে রাজি হলাম।

সবসুদ্ধ পাঁচজন আমরা। আমার হাতে বন্দুক নেই। ছেলেমানুষ, বন্দুক সামলাতে পারব না। তাই আমার হাতে একটা বল্লম। একটা আট ইঞ্চি বড় পেরেক লম্বা লাঠির মাথায় শক্ত করে বেঁধে দিয়েছেন। তাক করে বাঘের চোখে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই বাঘ কাবু। এ তো আর বন্দুক নয় যে গুলি ফস্কাবে। একবার ফস্কালেও হাতের অস্ত্র হাতেই থাকবে। মাখন, ছানা, দৈ—তিন ভাইয়ের হাতে তিনটি শক্ত মোটা লাঠি। ওরা তো আর বাঘ মারবে না। শুধু দূর থেকে হৈ-হল্লা করবে আর বাঘ মারা পড়লে ল্যাজ ধরে টেনে নিয়ে আসবে। দৈ-এর ঘাড়ে একটা ছাগলের বাচ্চা, ওটাকে ভেট হিসেবে বেঁধে রাখা হবে। ছাগলছানার লোভে বাঘ নিশ্চয়ই কাছে এগিয়ে আসবে—সেইজন্যে এই ব্যবস্থা।

পাঁচজনেই হেঁটে যাচ্ছি। জঙ্গল জায়গায় জায়গায় বেশ ঘন। পাশের গাঁয়েই এরকম ঘন জঙ্গল থাকতে পারে আমরা কখনো ভাবিনি। জঙ্গলের মাঝখানে একটা পুরনো পুকুর, অসংখ্য কুলগাছ, কেয়াফুল আর আঁশ-শ্যাওড়ার ঝাড়। কখনও কখনও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আমগাছ চোখে পড়ল। কোন্ আমলের কে জানে। ঘুরে ঘুরে দেখে একটা জায়গা পছন্দ করলেন মহরম ভাই। প্রকাণ্ড দুটো আমগাছ দুপাশে। মাঝখানে ফাঁকা পরিষ্কার একটুখানি জায়গা। সেই জায়গায় ছাগলের বাচ্চাকে বাঁধা হলে পর দেখলাম, বাচ্চাটা পড়ে থাকা গাছের পাতা খেতে আরম্ভ করে দিল। চারদিকে তাকিয়ে দেখে মহরম ভাই বললেন, 'আমি এই গাছটায় উঠে বসে থাকব আর তোরা ঐ ওদিক থেকে বাঘ তাড়িয়ে নিয়ে আসবি। ওদিকেই কোথাও আছে বাঘটা। তাড়া খেয়ে এদিক পানে আসতে আসতে ছাগলছানা দেখে যখন পরমানন্দে বাচ্চাটার ঘাড় মটকাতে আসবে, তখন ওপর থেকে আমি...'

কথাটি শেষ না করে বন্দুক তাক করে দেখালেন অর্থাৎ ছাগলের বাচ্চাটা খেতে এলেই ওপর থেকে বুলেট খেয়ে বাঘের দফাটি রফা হয়ে যাবে।

আমার ভয় হচ্ছে একটু একটু। আনন্দও হচ্ছে। মাখন, ছানা, দৈ-দের মুখে হাসি। ওদেরও মজা লাগছে।

'আচ্ছা আমি তাহলে গাছে উঠি।' মহরম ভাই উঠতে গেলেন। গাছের গুঁড়িটা বিশাল। তাছাড়া পায়ে হান্টিং বুট, ব্রিচেস, ক্রশবেল্ট-ভর্তি গলি আর দু-কাঁধে দুটো বন্দুক। মহরম ভাই ফিরে এলেন। বললেন, 'আমাকে গাছে উঠিয়ে দিয়ে যা তোরা। জুতো পরে নিজের থেকে ওঠা যায় না।' মাখন, ছানা, দৈ তাকে ঠেলেঠুলে তুলল। দৈ আগে গাছে উঠে ওপরে টেনে তুলল আর নিচ থেকে দু ভাই ওপরে ঠেলে দিল।

দৈ মহরম ভাইকে ওপরে রেখে নামতে যাবে, হঠাৎ চিৎকার। দেখলাম মহরম ভাই দুহাতে গাছের ডালটা জড়িয়ে ধরে আছেন আর চেঁচাচ্ছেন। তার পা ফস্কে গেছে।

দৈ আবার ওপরে ডালে উঠে ঠিকমতো করে বসাল। মহরম ভাই তখন গালাগাল দিচ্ছেন, 'এ্যাঃ, তোদের গ্রামের গাছগুলো কী ডেঞ্জারাস রে! তোদের জঙ্গলের গাছের ডালগুলোও ঠিকমতো গজায় না। এমন জায়গায় মানুষ আসে!'

আমরা লজ্জা পেলাম। সত্যি তো, কী বেকায়দা মতো ডালদুটো গজিয়েছে। অত কাপড়চোপড় পরে একটা মানুষ আরাম করে যে বসবে তার জো নেই।

'এক কাজ কর্,' মহরম ভাই পরামর্শ দিলেন। পকেট থেকে একটা দড়ি বার করে বললেন, 'এই দড়িটা দিয়ে আমার কোমরের বেল্টের সঙ্গে গাছের ডালে বেঁধে দিয়ে যা। যদি পা পিছলে যায় তো সামলে নেব।'

দৈ সেই কথামতো কাজ করে নিচে নেমে এল। তারপর মহরম ভাইয়ের নির্দেশমতো আমরা কজনা বাঘ-তাড়ুয়া বাঘ তাড়িয়ে আনতে চললাম।

তখন বিকেল হয়ে গেছে। আমরা হৈ হৈ, হুশ হুশ করে চক্কর দিয়ে এলাম। বেশ অনেকটা পথ। মাখন, ছানা, দৈ তিন ভাই সবকটা ঝোপ পেটাল।

সর্বক্ষণ কান পেতে রয়েছি। কখন গুড়ুম করে শব্দ হয়। অনেকবার কান পেতে শুনে ফিরে এলাম। এসে দেখি মহরম ভাই তেমনি বসে আছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'বাঘ এসেছিল মহরম ভাই?'

'না আসেনি। তোরা কোনো কাজের না। বাঘটা ওদিকেই আছে। অতবড় একটা জানোয়ার তোদের চোখেই পড়ল না। তোদের কপালে ওগুলো কী-রে, চোখ না মার্বেল?'

'ঝোপ তো পেটাতে বাকি রাখিনি।'

'বুঝেছি, বুঝেছি!' মহরম ভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। ছাগলের বাচ্চাটাও চুপ করে আছে। আর কিছু না পারিস ওটাকে মার্। যেন চেঁচিয়ে ডাকে। ডাক শুনতে পেলেই বাঘ আসবে।'

কথামতো থাপ্পড় মারলাম ছাগলের বাচ্চার গায়। সেটা শুয়েছিল, মার খেয়ে তড়াক করে ছুটে পালাতে চাইল। আবার মারলাম। ছাগলের বাচ্চা তবু ডাকে না।

কী মুশকিল, এ কেমন ছাগলের বাচ্চারে বাবা। এত মারি চ্যাঁ ভ্যাঁ কিচ্ছু করে না।

'কীরে, হল?'

কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললাম, 'ছাগলের বাচ্চাটা ডাকছে না মহরম ভাই।'

মহরম ভাই আরো বিরক্ত হলেন। বললেন, 'জানতাম ডাকবে না। তোদের গেঁয়ো ছাগল তো। ভয়েই চুপ মেরে গেছে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'জোরে মার্, গায়ের জোরে।'

আমি বল্লমের আগা দিয়ে জোরে মাথায় মারলাম খোঁচা। ছাগলের বাচ্চাটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দড়ি ছিঁড়ে দে ছুট। সরু দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। খোঁচা খেয়ে মরিয়া হয়ে ওটা ছুটেছে, সরু দড়ির বাঁধন টেকেনি।

'দিলি তো!' ওপর থেকে মহরম ভাই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমি জানতাম।'

মাখন আর ছানা ততক্ষণে ছুটে গিয়েছে ছাগলের বাচ্চার পিছু পিছু। ওরা একটু পরে আবার বাচ্চাটাকে ধরে নিয়ে এল। আবার শক্ত করে বাঁধল।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, 'মহরম ভাই, সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে এবার নেমে আসুন—ফিরে যাই, আজ আর বাঘ আসবে না।'

'ননসেন্স।' মহরম ভাই ধমকে উঠলেন। 'বাঘের খবর তোরা কী জানিস? ও ঠিক আসবে, তোরা বরং পুকুরধারের বটতলায় গিয়ে বসে থাক্। মাখনের কাছে দেশলাই আছে, শুকনো পাতা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে নিবি।'

কী আর করা যাবে। মাখন, ছানা, দৈ তিনজনেরই কেমন মজা লাগছিল কী দেখে যে খোদা জানে।

আমরা বটতলায় ফিরে এসে পাতা কুড়িয়ে আগুন জ্বাললাম। এখন মন্দ লাগছে না। আগুনের ওদিকে অন্ধকারে ভয় পেয়ে ছাগলের বাচ্চাটা ম্যা ম্যা করে চিৎকার করছে। চারপাশে গোল হয়ে আমরা গল্প করছি। আমি মহরম ভাইয়ের গুণগান করছি তখন। ঢাকা শহরে থাকেন, মোটরগাড়ি চড়ে বেড়ান। তিন-চারটে বন্দুক নিজেরই আছে। প্রত্যেক বছর সুন্দরবনে শিকার করতে যান। যত কথা শুনেছিলাম মহরম ভাইয়ের সম্পর্কে সব বললাম।

পাতাগুলো জ্বলে শেষ হলে মাখন বলল, 'আমি যাই দেখে আসি কী হল।'

মাখন চলে যাবার একটু পরে গুড়ুম করে একটা বিকট শব্দ হল।

আমরা লাফিয়ে উঠলাম। তাড়াতাড়ি কিছুটা এগিয়ে যেতে দেখলাম, দমাদম শব্দে লাঠি পড়ছে। মাখনই লাঠিপেটা করছে কিসের ওপর যেন।

কাছে যেতেই বলল, 'হারামজাদা শেয়াল, ছাগলের বাচ্চাটা খেতে এসেছিস। বন্দুকের শব্দে সটকাতে যাচ্ছিল। হ্যাঁ বোঝ এবার। আর কেউ নয় মাখনের লাঠি।'

দেখলাম শেয়ালটা টানটান হয়ে পড়ে আছে। হঠাৎ খেয়াল হল, মহরম ভাই-এর কী হল, কিসের ওপর গুলি করলেন তাহলে!

কাছাকাছি যেতেই শুনতে পেলাম, চিঁ চিঁ স্বরে মহরম ভাই ডাকছেন, 'ওরে ভাই সন্দেশ, ওরে ভাই মাঠা রে, ওরে কই রে আমারে বাঁচা রে, আমি মরে গেলাম রে, আমাকে বাঘে খেয়ে ফেলল রে...'

আমরা ছুটে গেলাম। গাছতলায় গিয়ে ওপরে তাকালাম। দেখলাম, আহা কী দৃশ্য!

হাতের বন্দুকটা মাটিতে। মহরম ভাই, মানে মরহুম ভাই কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঝুলছেন শূন্যে। ঝুলছেন আর কাঁদো-কাঁদো স্বরে চেঁচাচ্ছেন। মাখন ছানা দইয়ের নাম ভুলে যা মনে আসছে তাই বলে ডাকছেন, 'সন্দেশ রে, ওরে ক্ষীর, ওরে ছানা...আয় ভাই আমাকে বাঁচা, বাঘে খেয়ে ফেলল রে...'

সেদিন মহরম ভাইকে নামিয়ে ফিরে এসেছিলাম। তার পরদিনই মহরম ভাই ঢাকা চলে গেছেন; যাবার সময় বলে গেছেন, 'তোদের কোনো উন্নতি নেই, সত্যি। বাঘ নেই তোদের জঙ্গলে। শুধু শেয়াল, ছোহ্—আগে জানলে কে আসত!'

হেমাপ্যাথি, এ্যালাপ্যাথি

হাসান আজিজুল হক

তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমাদের গাঁয়ে দুজন ডাক্তার ছিলেন। একজন হোমিওপ্যাথ আর একজন এ্যালোপ্যাথ। গাঁয়ের লোক ঠিক ঠিক বলতে পারত না—একজনকে বলত হেমাপ্যাথি আর একজনকে বলত এ্যালাপ্যাথি। দুজনের চিকিৎসার ধরন ছিল বাঁধা। ওষুধও দিতেন একরকম।

হোমিওপ্যাথ অঘোর ডাক্তারের কাছে গেলেই একটুখানি সাদা ময়দার মতো গুঁড়োতে দুতিন ফোঁটা স্পিরিট টপ টপ করে ফেলে তিন-চারটি পুরিয়া করে দিতেন। খেতে ভালোও লাগত না, মন্দও লাগত না। কখনো কখনো আবার স্রেফ টিউবওয়েলের পানিতে দু-তিন ফোঁটা স্পিরিট মিশিয়ে দিয়ে বলতেন, 'যা খাগে যা।'

ওষুধ হাতে নিয়ে, আমি হয়তো ফস্ করে জিজ্ঞেস করে বসতাম, 'ডাক্তারবাবু ভালো হবে তো?' অঘোর ডাক্তার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠতেন, 'ভালো হবে না মানে? ভালো হয়ে উপচে পড়বে। যা, ওষুধ খাগে।'

আমি বলতাম, 'পেটের মধ্যে যে কেমন করে সব সময়।'

'করবে না? যা, আরো বেশি করে কাঁচা আম খাগে নুন মরিচ মাখিয়ে।'

আমি বলতাম, 'পেটের ভেতর গরগর করে।'

'ও কিছু না, ব্যাঙ হয়েছে তোর পেটে।'

'ওরে বাবা, ব্যাঙ হয়েছে আমার পেটে! গোঁগোঁ শব্দ হয় যে ডাক্তারবাবু।'

'ও কিছু না—ব্যাঙ ডাকে গোঁগোঁ করে। আমার ওষুধ যেই এক পুরিয়া খাবি, দেখবি তখন ব্যাঙের লাফানি।'

'কী করে দেখব? ব্যাঙ যে পেটের ভেতরে।'

অঘোর ডাক্তার তখন বলতেন, 'ওরে বাবা, দেখবি মানে বুঝবি। বুঝবি ঠেলা।'

এই হচ্ছে আমাদের গাঁয়ের এক নম্বর ডাক্তার অঘোরবাবুর কথা।

এইবার দুই নম্বর তোরাপ ডাক্তারের কথা বলি। আগেই বলেছি, ইনি ছিলেন এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার। কী করে যে তিনি ডাক্তার হয়েছিলেন, কেউ জানে না। শোনা যায়, বাল্যকালে তিনি নাকি এক বড় ডাক্তারের হুঁকো সাফ করতেন। সে যাই হোক, তোরাপ ডাক্তারের একটা ছোট্ট শেয়ালে-রঙের বেতো ঘোড়া ছিল। তার সামনের পাদুটি ছাঁদনা দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত প্রায় সময়। এই বাঁধা পা নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে গাঁয়ের আশেপাশে চরে বেড়াত ঘোড়াটা। কারো ক্ষতি করতে দেখিনি কোনোদিন।

বাইরের গাঁয়ে 'কল' থাকলে তোরাপ ডাক্তার ঘোড়াটার পিঠে একটা চটের বস্তা চাপিয়ে তার উপর বেশ জুত করে বসতেন। তিনি নিজে জুত করে বসতেন বটে, কিন্তু ডাক্তারের দেহের চাপে ঘোড়াটির শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে যেত। তারপর হটর হটর করে সেই বেতো ঘোড়া মাঠের মধ্যে দিয়ে আলপথ ধরে রুগির গাঁয়ের দিকে এগোত।

তোরাপ ডাক্তারের দেহের কাঠামো ছিল বিরাট—কিন্তু কেমন যেন লোনাধরা পুরনো ইঁটের বাড়ির মতো। সারা দেহটা তাঁর হলবল নড়বড় করছে! ইয়া মোটা চওড়া হাতের কব্জি—এই চওড়া মুখ; গালের উপরের দিকে দুই উঁচু হাড় যেন চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে। তাঁর গায়ের চামড়া ছিল খসখসে, চুলগুলো খোঁচা খোঁচা, ধ্যাবড়া পা-জোড়া ছিল ফাটা। লোহার ডাণ্ডার মতো শক্ত কালো কালো মোটা মোটা আঙুল। দেখলেই পিলে চমকে যেত। লোকে বলত, তোরাপ ডাক্তারকে দেখলেই রোগ পালায়। তা ঐরকম চেহারা দেখলে কি আর রোগ থাকতে পারে?

তোরাপ ডাক্তার খালি ডাক্তারিই করতেন না কিন্তু। নিজের হাতে হালচাষ করতেন। বর্ষা আর শীতের সময় ডাক্তারির ধার ধারতেন না তিনি। বর্ষাটা হচ্ছে চাষবাসের সময় আর শীতকালটা হচ্ছে ফসল কাটার মরশুম। এই দুই মরশুমে তোরাপ ডাক্তার সারাদিনই থাকতেন মাঠে, নিজের একজোড়া রোগা বুড়ো বলদ দিয়ে জমি চষছেন, নাহয় নিজের হাতে ধান রুইছেন। এই সময় রুগি মরে গেলেও তোরাপ ডাক্তারকে পাওয়া যাবে না।

বর্ষা আর শীতে গাঁয়ের লোকদের রুগি হয়ে শুয়ে থাকার কোনো উপায় নেই। এই দুই সময়ে কাজ করতে না পারলে পেটে ভাত জুটবে না। কাজেই রোগটোগ সব শিকেয় তুলে রেখে দিতে হত তাদের বাধ্য হয়ে। তারপর শরৎকাল এলে

তোরাপ ডাক্তারের মোটামুটি অবসর হত আর গাঁয়ের লোকদেরও রুগি হয়ে শুয়ে থাকার একটু-আধটু মওকা মিলত।

এই সময়ের জন্যেই যেন ওঁৎ পেতে থাকত ম্যালেরিয়া জ্বর। বাঘ যেমন গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের টুঁটি কামড়ে ধরে, ঠিক তেমনি করে ম্যালেরিয়া জ্বর এসে গাঁয়ের গরিব লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। এটা ঘটত আশ্বিন মাস থেকে। ম্যালেরিয়ার মতো বাঘা জ্বর তখন আর কিছু ছিল না। ঘরে ঘরে মানুষ ছেঁড়া কাঁথা, ন্যাকড়া, ত্যানা গায়ে চাপিয়ে কোকাত। আর সে কী কাঁপুনি! কাঁপুনি থামাবার জন্যে পাথরের জাঁতা পর্যন্ত গায়ে চাপাতে দেখেছি।

এই সময়টায় ছিল তোরাপ ডাক্তারের মজা। ঘরে ঘরে লোক ম্যালেরিয়া জ্বর ধুঁকছে। চিকিৎসার জন্যে তোরাপ ডাক্তার ছাড়া গতি নেই। ম্যালেরিয়া পুরনো হয়ে গেলে কিছুতেই সারতে চায় না। পেটের মধ্যে পিলে উঁচু হয়ে ওঠে, হাত পা হয়ে যায় প্যাঁকাটির মতো সরু। তোরাপ ডাক্তারের এইরকম অনেক পিলে-ওঠা পুরনো ম্যালেরিয়া-রুগি ছিল।

রোগের আর একটা সময় ছিল চোত-বোশেখ মাস। এই সময়টায় কলেরা আর বসন্ত হয়ে গ্রামকে গ্রাম সাফ হয়ে যেত। গাঁয়ে কলেরা লেগেছে শুনলে আনন্দে তোরাপ ডাক্তারের চোখ চকচক করে উঠত। ম্যালেরিয়া আর কলেরার সব রুগি তোরাপ ডাক্তারের। এখানে অঘোর ডাক্তারের কোনো ভাগ ছিল না। জ্বর হলে, সর্দি হলে, বেশি খেয়ে বা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে পেট ছেড়ে দিলে লোক অঘোর ডাক্তারের কাছে যেত। আনা দুই পয়সা দিলেই, তিনি দিয়ে দিতেন দুই-তিন পুরিয়া ওষুধ। পয়সা দিতে না পারলে ধারেও দিতেন। এমনকি একটা লাউ বা দুটো শশা নিয়ে গেলেও তিনি রুগি ফেরাতন না।

অঘোর ডাক্তারের চাষবাসও ছিল না, ভিনগাঁয়ে 'কলে' যাবার ঘোড়াও ছিল না। হোমিওপ্যাথি ঔষুধ রাখার জন্য একটা কাঠের বাক্স ছাড়া চিকিৎসার সরঞ্জাম বলতে আর কিছুই ছিল না তাঁর। তবে ওরকম বাক্যবাগীশ লোক লাখে একটা মিলবে কিনা সন্দেহ।

বেলা আটটার সময় তিনি ঝকঝকে একটা পেতলের গাড়ু হাতে মাঠ থেকে প্রাতঃকৃত্য সেরে রুগিদের বসিয়ে রেখেই তাঁর বৈঠকখানার উঁচু দাওয়ার একদিকে বসে নিমের দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজতেন, আর হাক-থু হাক-থু করে গলা, জিভ পরিষ্কার করতেন। সারগাঁয়ের লোক টের পেত অঘোর ডাক্তার মুখ-হাত ধুচ্ছেন। একদিকে হাত-মুখ ধোয়া চলছে, অন্যদিকে কথার তুবড়ি ছুটছে তাঁর মুখ দিয়ে।

তিনি বলতেন, 'বলি, মরতে তোরা আমার কাছে আসিস কেন বল্ দিকিনি। তোরাপের কাছে যা না। তা তো যাবি না–গেলে যে ব্যাটা কসাই ঘাড়টি মটকে তাজা রক্ত খাবে তোদের। বলি, এ কী ডাক্তারি বল্ দিকিন তোরা? তুই বললি, আমার অসুখ করেছে, আর অমনি তোরাপ হয় ছুরি বার করবে, নাহয় কোদাল বার করবে, নাহয় কুড়াল বার করবে...'

একজন রুগি হয়তো বাধা দিয়ে বলল, 'না না ডাক্তারবাবু, তোরাপ ডাক্তার আবার কোদাল কুড়ুল কবে বার করলে!'

'ঐ হল, লাঙলের ফালের মতো ছুঁচওয়ালা একটা বোতল বার করল। কী? না ইঞ্জেকশন দোব, গলা কাটব, মারব, ধরব। তারপর ওষুধ চাও, দেবে তোমাকে এক বোতল পিশেচের রক্ত। ওয়াক থু। যেমন দুর্গন্ধ, তেমনি বিচ্ছিরি সোয়াদ—ছ্যা ছ্যা ছ্যা! আর আমাদের হোমিওপ্যাথ কী করছে? বাঘ যেমন ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি করে একটি পুরিয়ার আমার এই ওষুধ তোমার পায়ের আঙুলের ডগা থেকে জীবাণু বাবাজিদের খেদাতে খেদাতে মাথার চুলের ডগা দিয়ে বার করে দিচ্ছে। অথচ তুমি জানতেও পারছ না।'

এইরকম তোড়ে বক্তৃতা করতেন অঘোর ডাক্তার। পয়সা কম লাগে বলেই হোক, আর বক্তৃতার জন্যেই হোক, সারা বছরই দু-চারটি রুগি অঘোর ডাক্তারের কাছে যাতায়াত করত। রুগি না পেলে তোরাপ ডাক্তার রাগে গজগজ করতেন, 'ও ব্যাটা অঘোরের সব ওষুধ আমি একবারে খাব, আমার কিছুই হবে না। আর ও খাক দিকিনি আমার একশিশি ওষুধ, দ্যাখ্ কী হয়!'

কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করল, 'কী হবে ডাক্তারসাহেব?'

'একশিশি খেলে?' তোরাপ ডাক্তার জিজ্ঞেস করতেন, তারপর নিজেই জবাব দিতেন, 'জামাকাপড় খারাপ হয়ে যাবে—গাড়ু হাতে ঘর-বার করতে করতে জান নিকলে যাবে।'

'আপনার ওষুধে বিষ আছে সবাই জানে।'

এই কথা শুনে রাগে তোরাপ ডাক্তারের মুখের চেহারা একেবারে গরিলার মতো ভয়ংকর হয়ে উঠত। জ্ঞানহারা হয়ে চিৎকার করতেন তিনি গলা ফাটিয়ে, 'বিষ আছে? আছেই তো। বিষ ছাড়া ওষুধ হয় ইগনোর‍্যান্ট কোথাকার? নিয়ে আয় তোদের অঘোর ডাক্তারকে, একটি ডোজে তাকে চৌদ্দভুবন দেখিয়ে দেব।'

সে-বছর শরৎকালে ধান কেবল ডাঁশিয়ে উঠছে, ধানের ভেতর সাদা দুধ জমে চাল বাঁধছে, বেশ ঝরঝরে আবহাওয়া, আকাশভর্তি রোদ, একটু একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে—এমনি সময়ে হুড়মুড়িয়ে চলে এল ম্যালেরিয়া জ্বর। ঠিক যেন পাহাড় বেয়ে একটা পেল্লাই ভালুক নেমে এল।

ব্যস্, ম্যালেরিয়া জ্বরে লোক দমাদম বিছানা নিতে লাগল। ছেলে বুড়ো কেউ বাদ যায় না। ম্যালেরিয়া যাদের পুরনো হয়ে গেছে তাদের তো খুব মজা। ঠিক বেলা দশটার সময় চোখে সূর্যটা একটু হলুদ হলুদ ঠেকে, তারপর গা একটু গরম হয়, চোখদুটি সামান্য জ্বালা করে তবে তারপর হুড় হুড় করে এসে পড়ে জ্বর। সঙ্গে সঙ্গে কী পিপাসা! ঘটি ঘটি পানি খেয়ে পিপাসা কমে না। পানি পেটে গিয়ে গরম হয়ে যায়, তারপর গা-টা গুলিয়ে ওঠে, তারপরেই বমি। বমি হয়ে গেলেই আবার পিপাসা। আবার ঘটি ঘটি পানি খাওয়া তারপর আবার বমি। এই করতে করতে বিকেল হয়ে যায়, নীল আকাশে একটা

অদ্ভুত সুন্দর আলোর আভা রেখে সূর্য ডুবে যায়। জ্বর কমে আসে আস্তে আস্তে। রাত দশটার দিকে একদম জ্বর চলে গিয়ে গা ঠাণ্ডা।

পরের দিন আবার বেলা ঠিক দশটার সময় জ্বর-ভালুক গুঁড়ি মেরে লোকের বাড়ি বাড়ি চলে আসে। গাঁয়ের অর্ধেকের বেশি লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়ল। তোরাপ ডাক্তারের আনন্দ আর ধরে না। হলুদ রঙের বড় বড় বিকট দাঁত বের করে এ্যাই-বড় সিরিঞ্জ নিয়ে, রুগিদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে লাগলেন তিনি। দুই পকেট ভর্তি ম্যাপাক্রিন বড়ি। সে যে কী ভয়ানক বড়ি ভাবা যায় না। রুগি যেখানেই থাক, সে মাটির দাওয়াতেই হোক আর খোলা আকাশের নিচে উঠোনেই হোক বা ঘরের ভেতরেই হোক, গলায় স্টেথোটি ঝুলিয়ে ইনজেকশনের বাক্সটি হাতে নিয়ে তোরাপ ডাক্তার ঠিক হাজির। লোকেই বা আর কী করে—যেমন-তেমন করে সুস্থ হয়ে না উঠলেও তো পেট চলে না। ছেলেমেয়ে খাবে কী? কষ্টেসৃষ্টে চাষবাস করে বা জনমজুর খেটেই তো সবাই কোনোরকমে সংসার চালায়। কাজেই বাধ্য হয়ে তোরাপ ডাক্তারকে ডাকতেই হয়। বেচারা অঘোর ডাক্তারের গুঁড়োতে যে কোনো কাজই হয় না।

সে যাই হোক, ঘরে ঘরে ঢুকেই গোদা গোদা এ্যাঁকাব্যাঁকা আঙুল দিয়ে তোরাপ ডাক্তার রুগির কব্জি চেপে ধরে কিছুক্ষণ নাড়ি পরীক্ষা করতেন। মুগুরের মতো সেই ধ্যাবড়া আঙুলের চাপেই রুগির নাড়ি ছেড়ে যাবার দশা হত। নাড়ি দেখা হলে তোরাপ ডাক্তার রুগিকে বলতেন, 'জিভ বার কর্।' তারপর সেই জিভ বার করা অবস্থাতেই আদ্যিকালের স্টেথোটা গলা থেকে খুলে খানিকক্ষণ বুক পেট দেখে বলতেন, 'হয়েছে, আর জিভ বার করে থাকতে হবে না, আমার বোঝা হয়ে গেছে।'

রুগীর সব বলাই সাধু। হয়তো জিজ্ঞেস করল, 'তবে কি 'ম্যালোরি' জ্বর ডাক্তার সাহেব?'

তোরাপ ডাক্তার দাঁত কড়মড়িয়ে বলতেন, 'তাছাড়া আর কী হবে?' এই যে দেখাচ্ছি মজা, একটি ইঞ্জেকশনে ম্যালেরিয়ার ভূত ছাড়াব—' এই বলে আশেপাশের লোকদের আদেশ দিতেন, 'ধর্ তো এটাকে চেপে, সুঁইটা দিয়ে দিই একবার। আর দুটো টাকা রাখ্ এখানে আমার সামনে, আমার ফি আর ওষুধের দাম। উঁহু আগে টাকা রাখ্, তারপর অন্য কাজ।'

এই বলে তোরাপ ডাক্তার একদিকের পকেটে টাকাদুটো ভরতেন, আরেক পকেট থেকে বের করতেন ইঞ্জেকশন দেবার সিরিঞ্জ। কী প্রচণ্ড সিরিঞ্জ! আর তার ছুঁচ তো নয়, ঠিক যেন মোষের লাঙলের ফলা। লোকের গায়ে ফুঁড়তে ফুঁড়তে ছুঁচের মাথা গিয়েছে ভোঁতা হয়ে। সেই ভয়ানক যন্ত্র দেখেই তো রুগি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পালাবার চেষ্টা করত। তোরাপ ডাক্তার চিৎকার করতেন, 'ধর্ ধর্, ঠেসে, চেপে ধর্'—সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারজন ষণ্ডাগোছের লোক গিয়ে বিছানার সঙ্গে চেপে ধরত রুগিকে। তারপর কোমরের কাপড়ের কষিটা খুলে তোরাপ ডাক্তার মাংসের মধ্যে প্যাঁট করে ঢুকিয়ে দিতেন সেই মোটা ছুঁচ। সাথে সাথে রুগির সমস্ত পা-টা যেত অবশ হয়ে।

এইরকম করে ইঞ্জেকশন দিয়ে সে-বছর শরৎকালে তোরাপ ডাক্তার দুহাতে টাকা রোজগার করতে লাগলেন। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যত বাড়ে ততই বাড়ে তাঁর রোজগার। ইঞ্জেকশন দিয়ে তিনি দু-তিনটে লোককে তো চিরদিনের জন্য খোঁড়া করে দিলেন। তাঁর ম্যাপাক্রিন বড়ি খেয়ে কয়েকজন তো চিরকালের জন্য কালা হয়ে গেল। তবু লোকে বাধ্য হয়ে তার কাছেই যেতে লাগল। হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে ম্যালেরিয়ার মতো দুর্দান্ত জ্বর ঠেকানোর সাধ্য ছিল না অঘোর ডাক্তারের। তাঁর কাছে আর কেউ যায় না। এদিকে ম্যালেরিয়ার ভয়ে সর্দি, কাশি, হাঁপানি, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা—এইসব রোগ কোথায় যে পালাল! অঘোর ডাক্তার সকালবেলায় বৈঠকখানার ফাঁকা দাওয়ায় বসে হাক-থু হাক-থু করে গলা পরিষ্কার করেন আর তোরাপ ডাক্তারের মুণ্ডুপাত করে গালাগালি দিতে থাকেন। এক পয়সা উপার্জন নেই—একটা রুগিও এদিকে মাড়ায় না। তাঁর সংসার চলাই দায় হয়ে উঠল। শেষপর্যন্ত কী আর করেন তিনি!

একদিন অঘোর ডাক্তার চুপিচুপি জেলা শহরে গিয়ে একটা সিরিঞ্জ আর কিছু কুইনাইন ইঞ্জেকশন কিনে আনলেন। মনে মনে বললেন, তোরাপটার বড্ড বাড় বেড়েছে। খুব দুপয়সা করে নিচ্ছিস, না? কিন্তু আমি হচ্ছি সব্যসাচী, সে খবরটা তো জানিস না তোরাপ। আমি দুইহাতে তীর ছুড়তে পারি। ইচ্ছে হলে হোমোপ্যাথি করব আবার ইচ্ছে হলে এ্যালাপ্যাথি ইঞ্জেকশন দেব। মনে মনে এইসব কথা ভেবে তিনি সিরিঞ্জের ছুঁচ কিনলেন খুব মিহি দেখে। কাউকে কোনো কথা না বলে সরঞ্জাম সব কিনে চুপি চুপি বাড়ি ফিরে এলেন সন্ধেবেলা।

পরের দিন সকালবেলায় মুখটি ধুয়ে দাওয়ায় কাঠের টুল পেতে কেবল বসেছেন তিনি—এমন সময় ইদরিস আলীর বাড়ি থেকে লোক এল। ইদরিস আর তার পুরো পরিবার অনেকদিন থেকে তাঁর রুগি। শত অসুখবিসুখে তারা কোনোদিন তোরাপ ডাক্তারের কাছে যায় না বলে : হেমাপ্যাথির ওপর ওষুধ আছে নাকি ডাক্তারবাবু? মরলে আপনার হেমাপ্যাথি খেয়েই মরব, তবু তোরাপ ডাক্তারের হাতে জান দিতে পারব না।

ইদরিস আলীর বাড়ির লোকের কাছ থেকে অঘোর ডাক্তার শুনলেন যে গত পাঁচ-সাত দিন থেকে ইদরিস নিদারুণ ম্যালেরিয়া জ্বরে বেহুঁশ। কিন্তু তোরাপ ডাক্তারের নাম করলেই তার হুঁশ ফিরে আসছে আর তখন সে বলছে, 'আমি অঘোর ডাক্তারের হেমাপ্যাথি খেয়ে মরব, কিছুতেই এ্যালাপ্যাথি চিকিচ্ছে করাব না।'

কথা শুনে অঘোর ডাক্তার মিটিমিটি হেসে বললেন, 'কেন রে, এ্যালাপ্যাথি চিকিচ্ছেটা খারাপ হল কোথায়? তোরাপ হল ডাকাত, ও আবার ডাক্তার হল কবে? এখন থেকে আমিই এক-আধটু এ্যালাপ্যাথি করব ভাবছি।'

ইদরিসের বাড়ির লোকটা অবাক হয়ে বলল, 'তুমি এ্যালাপ্যাথি করবে কী গো? তুমি আবার সুঁই দেবে নাকি?'

অঘোর ডাক্তার রেগে বললেন, 'কেন দেব না কেন? সব বিদ্যাই জানা আছে আমার বুঝলি? চিকিচ্ছেটা তোরাপের লাঙল চালানো নয়। কেমন মিহি সুঁই কিনেছি দেখবি। ইদরিসকে আজ ফুঁড়ব। তুই যা, আমি আসছি। আর শোন্ বাবা, দুটো টাকা আগে জোগাড় করে রাখিস। তোরাপও দুটাকা করে নেয়, আমাকে দিবি না কেন?'

অঘোর ডাক্তার কুইনাইন ইঞ্জেকশন দিবেন এই খবর দেখতে দেখতে সারা গাঁয়ে চাউর হয়ে গেল। গাঁয়ের যত সুস্থ মানুষ ছিল, সব ছুটল ইদরিসের বাড়ির দিকে। ইদরিসের মেটেবাড়ির ছোট্ট ঘরে আর তিল ধারণের জায়গা নেই—একটা লোক কোমরে চাদর জড়িয়ে হেঁড়ে গলায় চেচাঁতে লাগল, 'এই, এই সব বাতাস ছেড়ে দাও, বাতাস আসতে দাও।' কিন্তু কে কার কথা শোনে! অঘোর ডাক্তার হেমাপ্যাথি ছেড়ে ইঞ্জেকশন দেবে—একী সোজা কথা!

রোগা অঘোর ডাক্তার বহু কষ্টে ঘরে ঢুকে, ট্যাঁক থেকে সিরিঞ্জ, ওষুধ এইসব বের করলেন। লোকজনের দিকে তাকিয়ে তাঁর দুই হাঁটু থরথর করে কাঁপতে লাগল। মুখে অবশ্য তম্বি করলেন, 'ভিড় কমাও, আলো আসতে দাও তোমরা।'

এই কথা বলে বহু কষ্টে সিরিঞ্জের মাথায় ছুঁচ লাগালেন, তারপর ওষুধ ভরে রুগির দিকে এগিয়ে গেলেন। ঠিক এই সময় জ্বরের ঘোর ভেঙে জবাফুলের মতো গোল দুটো চোখ মেলে ইদরিস বলল, 'ডাক্তারবাবু শেষে আপনার এই কাজ!' এই বলে ইদরিস চোখ বন্ধ করে মড়ার মতো পড়ে রইল। অঘোর ডাক্তার বললেন, 'ধর্ বাবা তোরা, ইদরিসকে একটু ধর্।' চোখ না-খুলেই ইদরিস বলল, 'কাউকে ধরতে হবে না ডাক্তারবাবু, আপনি ইঞ্জিশন দ্যান—বরঞ্চ আপনাকে ধরতে হলে ওদেরকে বলুন।'

হঠাৎ কেমন বোকার মতো অঘোর ডাক্তার হাসলেন, তারপর ইদরিসের কোমরের নিচে মাংসে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'হেঁ হেঁ বড় মিহি কিনেছি ছুঁচটা, এই তুললাম', এই কথা বলে সকলের দিকে চেয়ে প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় আবার বললেন, 'হেঁ হেঁ তোরাপের কম্ম নয়, তোমরা দ্যাখো একবার, এই তুললাম সিরিঞ্জ, এইবার, এইবার'—বলেই প্যাঁট করে সিরিঞ্জের সুঁচ ঢুকিয়ে দিলেন ইদরিসের কোমরের মাংসে। হাত কাঁপতে লাগল তাঁর, বারবার বলতে লাগলেন, 'গভীর করে ফুঁড়তে হবে, গভীর করে ফুঁড়তে...এই যাহ্।' পট করে একটা আওয়াজ উঠল আর হাহাকার করে উঠলেন অঘোর ডাক্তার, 'হায় হায়, ছুঁচ ভেঙে গেছে, ছুঁচ ভেঙে গেছে, গেল গেল, সর্বোনাশ হল, হায় হায়...।'

ছুঁচটা তখন মাংসের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। অঘোর ডাক্তারের শীর্ণ দুই হাত আঁতিপাঁতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেটাকে। তখন কোথা থেকে একটা জোয়ান ছেলে ছুটে এসে দাঁত দিয়ে কামড়ে তুলে ফেলল ছুঁচটা ইদরিসের কোমর থেকে। সবাই চুপ করে আছে—ছেলেটা দাঁত থেকে খুলে হাতে নিল ছুঁচটা, অঘোর ডাক্তারের দিকে চেয়ে বলল, 'এই যে ডাক্তারবাবু পেয়েছি।' অঘোর ডাক্তার দেখতে পেলেন না। ক্ষোভে দুঃখে তখন তাঁর চোখে অশ্রুর ঢল নেমেছে।

ফেলুমামার কবলে ছেলেধরা

নিয়ামত হোসেন

'একজন নয়, দুজন নয়, পুরো একটা গ্যাং। শিশু অপহরণকারী। মানে ছেলেধরা! বুঝলি?' ফেলুমামা বলছিলেন, শুনছিলাম আমরা। 'প্রথমটা কী যে ভয় হচ্ছিল আমার! কিন্তু একটু সাহস করে বুদ্ধি ঠিক করলাম। তারপর কেল্লাফতে!'

ফেলুমামা বলছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। ছেলেধরার কবলে একবার পড়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছিলেন। মামা যে এ-ধরনের কোনো অবস্থায় পড়েছেন, আমরা তা-ই জানতাম না। সেইজন্যে কাহিনীটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম।

আমাদের ধারণা ছিল, ফেলুমামাকে ছেলেধরারা ধরতে পারবে না অর্থাৎ ছোটবেলায় পারেনি কোনোদিন। এমন কোনো ছেলেধরা অর্থাৎ ফেলুধরা তাঁর ছোটবলায় কেউ থাকতে পারে, এ আমাদের ধারণার বাইরে।

তাই শুনতে লাগলাম তাঁর কথা প্রায় রুদ্ধশ্বাসে।

'তোদের তখন জন্মই হয়নি। হলেও একেবারে ছোট্ট। মনে থাকার কথা নয়। আমিই কি তখন বড় নাকি? বয়েস অপেক্ষা একটু বেড়ে গেছিলাম বলে একটু ঢ্যাঙা টাইপের দেখাত আর মুখটুখ নিশ্চয়ই গোবেচারাই ছিল, নইলে আমার দিকে ওদের নজর পড়তে যাবে কেন?'

গল্পের জট তখন খোলেনি বলে আমাদের নিশ্বাস ততটা রুদ্ধ হয়নি। ওই ফাঁকেই দীপু জিজ্ঞেস করে বসল, ফেলুমামা তখন হাফপ্যান্ট ছেড়েছেন কিনা!

মামা কিছু বলার আগেই পান্তু বলল, 'এটা আবার কোনো প্রশ্ন হল নাকি?'

দীপু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'না, বয়সটা একটু আন্দাজ করবার জন্য আর কি!'

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'শুনতে দে, শুনতে দে। বকিস্ না।'

মামা গম্ভীর। কয়েক সেকেন্ড। তারপর গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললেন, 'তোরা সবাই যদি চেঁচামেচি করিস কর্। আমি একাই শুনতে থাকি।'

আমরা বললাম, 'না মামা, আর কোনো প্রশ্ন নয়। চেঁচামেচি নয়। এই আমরা মুখ বন্ধ করলাম।'

মামা বললেন, 'কথা উঠেছিল বয়েস নিয়ে। বয়েসে কী এসে যায়! কেউ কম বয়েসে পেকে যায়—যেমন তুই।' বলে একজনকে আঙুল দিয়ে দেখালেন।

'আবার কারো কারো এমন হয় যে শরীর, দেহ, নাক, কান, হাত-পা বাড়ছে, কিন্তু মগজ আর বাড়ছে না—যেমন তুই।' বলে আরেকজনকে ইঙ্গিত করলেন।

সে সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঢ্যাঙা পাদুটো আরো গুটিয়ে লুকোবার চেষ্টা করল।

এসব বলে মনের ঝাল কিছুটা কমিয়ে মামা তাঁর পুরনো কথায় ফিরে গেলেন। দ্বিতীয়বার অপমানের ভয়ে কেউ আর কোনো কথার ধারেই গেল না, তাঁর কথার সত্যমিথ্যা নিয়েও প্রশ্ন তুলল না।

ফেলুমামাকে বাড়ি থেকে বাজারে পাঠানো হয়েছিল। রঙ উঠে যাওয়া শার্ট আর পুরনো ছেঁড়া হাফপ্যান্ট পরে, হাঁটু পর্যন্ত ধুলোমাখা খালি পায়ে, ব্যাগহাতে তিনি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আর মনে মনে বারবার আওড়াচ্ছিলেন—'মাছ পটল ঝিঙে বেগুন নইলে সুপারি কিন্তু পান। মাছ পটল ঝিঙে বেগুন নইলে সুপারি কিন্তু পান।'

আসলে সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। ফেলুমামাকে বলা হয়েছিল, 'মাছ আনবে, পটল আনবে, ঝিঙে বা বেগুন যা হয় একটা আনবে, কিন্তু পান আর সুপারি আনতে যেন ভুল না হয়।'

ভুলে যাবার ভয়ে মনে মনে ওই ছড়ার লাইন তৈরি করে নিয়েছিলেন তিনি।

বাজারের কাছাকাছি হয়েছেন, এমন সময় একটা লোক জিজ্ঞেস করল, 'দুটো পাঁচ টাকা হবে?'

ফেলুমামার কাছে দুখানা পাঁচ টাকার নোটই ছিল। মামা পরোপকারিতার জোশে বুকপকেট থেকে চট করে নোটদুটো বের করে মুখটা হাসি-হাসি করার চেষ্টা করলেন।

লোকটা যেন ছোঁ মেরে নোটদুটো নিয়ে একখানা দশটাকার নোট মামার হাতে গুঁজে দিয়ে 'ধন্যবাদ' বলে হাঁটতে লাগল।

লোকটার দিকে না তাকিয়ে নোটটার দিকে তাকিয়ে দেখতেই মামার মনটা খারাপ হয়ে গেল। নোটটা ময়লা। তাতে কী আর হবে, যা হবার হয়ে গেছে।

ফেরানো যাবে না আর। কিন্তু তার উল্টোদিক ঘোরাতেই চমকে উঠলেন তিনি। নোটটার মাঝামাঝি ছেঁড়া। সাদা কাগজের পট্টিমারা!

লোকটা ততক্ষণে বেশ দূরে। মামা ছুটে গেলেন তার কাছে।

'এই যে, এই যে, কী নোট দিলেন? এটা তো চলবে না।'

'কেন? ওটা কি আমি বাড়িতে বানিয়েছি যে চলবে না?' লোকটির ঝাঁঝ-মেশানো উত্তর।

'আমার ওই টাকা ফেরত দিন। এটা নেব না।'

'কেন নেবে না?'

'চলবে না তাই।'

'আমি যদি চালাতে পারি?'

'বেশ চালান গে। আমার টাকা দিয়ে দিন।' মামার পরিষ্কার উত্তর।

'না, এ টাকা তুমিও চালাতে পারবে। বাজারে যাও, যে-কোনো দোকানদার নিয়ে নেবে!'

'যদি না নেয়? দরকার নেই। আপনার টাকা ফেরত নিন। আমি চালাতে পারব না।'

লোকটি বলল, 'তবে এসো আমি চালিয়ে দিচ্ছি।' বলে হাঁটতে লাগল।

পিছু পিছু না গিয়ে মামার উপায় নেই। যে-কোনো প্রকারে টাকা তো উদ্ধার করতে হবে।

লোকটা মামাকে নিয়ে ঢুকল এক মিষ্টির দোকানে। বসে অর্ডার দিল, 'দুটো করে চমচম।'

অর্ডার শুনে বেশ দিলদরিয়াই মনে হয় লোকটিকে। মামার মনে একদিকে টাকা চালাতে পারার খুশি, অন্যদিকে চমচম। সুতরাং দুবারে দুই গ্রাসেই তা শেষ।

'টাকাটা আমাকে দাও।'

বলে লোকটা মামার কাছ থেকে সেই দশটাকার নোটটা নিয়ে সুন্দরভাবে ভাঁজ করে দোকানের কাউন্টারে দিল। তারপর বাকি পয়সা নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। ফেলুমামা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন কাউন্টারের লোকটি টাকাটার ভাঁজ না খুলে অন্যান্য টাকার ভেতর নোটটিকে ছুড়ে দিল।

বাইরে বেরিয়ে লোকটি বলল, 'দেখলে তো কেমন করে চালাতে হয়।'

ফেলুমামা বলতে যাচ্ছিলেন, এ আপনার খুবই অন্যায়, কিন্তু তার আগেই লোকটি ফেলুমামার মুঠির মধ্যে কাউন্টার থেকে ফেরত পাওয়া বাকি টাকাগুলো গুঁজে দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে।

ফেলুমামা অবাক।

মিষ্টির বিল তাহলে মামাকে দিতে হল! লোকটা তো সাংঘাতিক!

এদিকটায় ভিড় একটু বেশি। আর একটু হলেই লোকটা ভিড়ে মিশে গিয়েছিল আর কি! মামা ছুটে গিয়ে ধরলেন তাকে!

'আরে একী! আমার দশ টাকা কই? বাজার করব কী দিয়ে?'

পেছনে ফিরে লোকটি বলল, 'আহা মিষ্টি খেলে না এইমাত্র!'

'আপনিও তো খেয়েছেন।'

'খেয়েছি তো! তুমিই তো খাইয়েছ!'

'আমি খাওয়াব কোথ্থেকে?'

'খাওয়াবে কী, খাওয়ালে তো!'

'না আমি খাওয়াইনি, আমার টাকা দিন!'

লোকটা বলল, 'ঠিক আছে চলো, তোমাকে টাকাও দেব, মিষ্টিও দেব।'

'কোথায়?' ফেলুমামার প্রশ্ন।

'আমার বাড়িতে।'

'কেন আপনার কাছেই তো টাকা আছে! এখান থেকে দিলেই হয়!'

'উঁহুঁ ওখান থেকে আমাকে কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে। রিকশা ভাড়া দিতে হবে। দরকার আছে!'

মহামুশকিল! রাজি না হয়ে উপায় নেই। কিছুতেই টাকা দেবে না লোকটা। বাজে অজুহাত দেখাচ্ছে! আর টাকা উদ্ধার না করে মামারও উপায় নেই।

যাহোক লোকটা অনেক ফন্দিফিকির করে ফেলুমামাকে নিয়ে চলল তার বাড়ি।

পথে দুবার দুটো দোকানে ঢুকল।

কিনল কি কিনল না বোঝা গেল না।

একটা রিকশায় উঠে কিছুটা গিয়ে তারপর নেমে, হাঁটতে হাঁটতে একটা গলি দিয়ে আবার অনেক দূর গিয়ে লোকটা ঢুকল একটা ঘরে। পেছনে ফেলুমামা।

ঘরের মধ্যে একটা ভাঙা চৌকিতে তাস খেলছিল চারজন লোক। অত্যন্ত রহস্যজনক চেহারা। এই লোকটার মতোই।

ওদেরকে দেখে একজন জিজ্ঞেস করল, 'কোথা থেকে আসলে?'

ফেলুমামার সঙ্গের লোকটা জবাব না দিয়ে মৃদু হেসে তাকাল ফেলুমামার দিকে। বলল, 'ওইখানে বসো গিয়ে।'

ফেলুমামার ভয়-ভয় করতে লাগল। বসলেন না তিনি।

আর একজন লোক তাস খেলতে খেলতেই বলল, 'এরে পাঠাইবা কোন্‌খানে?'

ধড়াস করে উঠল ফেলুমামার বুকটা। পাঠাবে মানে? তিনি কি ছেলেধরার কবলে পড়েছেন!

ভীষণ ভয় হল ফেলুমামার।

ভয়ের চোটে মামা সেই ঝিঙে-বেগুনের ছড়া গেছেন সম্পূর্ণ ভুলে। মামার শুধু মনে হচ্ছে তাঁকে নিশ্চয়ই কোনোখানে পাঠাবার মতলব করছে এরা। সেখানে রেখে তারপর তাঁকে দিয়ে কত রকমের কাজ করাবে। মামার মনে পড়ল, ছেলেধরারা ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙে ভিক্ষে করায়।

মামার মাথায় বুদ্ধি এল চট করে।

হাতের মুঠোয় যে টাকা ছিল, তা সেই লোকটির কাছে দিয়ে বললেন, 'এটাও আপনার কাছে থাক। আমি আসছিলাম বাজার করতে, আর দরকার নেই তার। আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না।'

মামার কথা শুনে সবাই ফিরে তাকাল তাঁর দিকে।

সেই লোকটি বলল, 'ফিরে যাবে না, তাহলে থাকবে কোন্‌খানে?'

'আপনাদের কাছে আমাকে রাখলে খুব ভালো হয়। আমি অনেক কাজ পারি। আমি যেখানে থাকি সেখানে আমাকে খুব কষ্ট দেয়। আমি আর যাব না।'

একজন বলে উঠল, 'এ আবার কেমন উল্টা কথা কয়।'

ফেলুমামার সঙ্গে আসা লোকটা বলে, 'তোমার আছে কে?'

'কেউ নাই। শুধু কিছু টাকা আছে।'

'টাকা?' চোখদুটো চিক্‌চিক করে উঠল লোকটার।'

'বেশি না। তিনশো টাকা। আমি কাজ করে জমিয়েছি। কিন্তু আমাকে তা দেয় না। বলে কোনো গার্জেন ছাড়া দেবে না।'

'তোমার কোনো গার্জেন নাই?'

'ছিল। দূরসম্পর্কের এক চাচা। উনি আমাকে কিছুটা পড়াশোনা শেখান। তারপর আর পড়াতে না পেরে এখন যে বাসায় থাকি, সেখানে কাজে লাগিয়ে দেন। উনি আর খোঁজখবর করেন না। আমি অনেকদিন ধরে বলছি, আমার টাকা দিয়ে দেন আমি আর কাজ করব না। ওরা বলে, তোমার কোনো গার্জেনকে নিয়ে এসো, তারপর টাকা নিয়ে চলে যেও। হয় তোমার চাচাকে আনো, নাহয় অন্য কেউ থাকলে তাকে আনো।'

বলেই ফেলুমামা মুখটা করুণ করে তাতে দুঃখ ফোটাবার চেষ্টা করলেন।

সেই লোকটি বলল, 'সত্যি বলছ, নাকি মিথ্যা!'

গলার স্বরে আরো দুঃখ ফুটিয়ে ফেলুমামা বললেন, 'আমার যদি কোনো গার্জেন থাকত এক্ষুনি ওই বাসা থেকে চলে এসে দেখাতাম সত্যি না মিথ্যা। তিনশো টাকা তো শুধু জমাই আছে। আর আমার মাইনা? এক বছর ধরে তা-ও জমা।'

'আমরা কে জানো?'

'জানি, জানি, আপনারা যা-ই হোন আমাকে কিন্তু ধরতে হবে না, আমি নিজেই আপনাদের ধরা দিয়ে আপনাদের কাছে থাকতে চাচ্ছি।'

সেই লোকটিসহ অন্য সবাই চুপ।

ফেলুমামা সেই লোকটার জামার খুঁট ধরে বললেন, 'ওরা আমাকে কাপড়চোপড় দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলে কী হবে, খুব কষ্ট দেয়। আমি আর ওখানে যাব না। আমাকে একটা কাজ দেবেন আপনি?'

লোকটা কিছু বলল না। সবার সঙ্গে সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

যে ঘরে ওরা কথা বলছিল আসলে সেটা একটা চায়ের দোকানের পেছনের দিক। দোকানের মুখ গলির দিকে। ওই দোকানের সামনে দিয়ে মামা আর লোকটি একটু

আগে এখানে এসেছেন। দোকান আর ঘরটির মাঝখানে মোটা বাঁশের চাটাইয়ের পার্টিশন। খদ্দের কম বলে বেশি গোলমাল কানে আসে না, অথচ চা বানানোর সময় চামচ নাড়ার শব্দও শোনা যায়।

তাস খেলছিল যে-লোকগুলো তাদের একজন বলল ফেলুমামার সঙ্গে আসা লোকটিকে, 'যা না, ওকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখ।'

ফেলুমামা লক্ষ করলেন, কথাটা বলেই লোকটি চোখ টিপে হাসল।

খেলায় মনোযোগ রেখেই আরেকজন বলল, 'এতগুলো টাকা আছে ছেলেটার! দ্যাখ্ না, উদ্ধার করে দিতে পারা যায় কি না। বাচ্চা ছেলে, কেউ নেই বেচারার।'

আগের সেই লোকটি গম্ভীর স্বরে বলল, 'চলো আমি তোমার সঙ্গে যাই। আমাকে তোমার আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে পারবে তো?'

'হ্যাঁ'। ফেলুমামা বললেন, 'বলব, রাস্তায় দেখা, আমার খোঁজের জন্যই আপনি আসছিলেন।'

'তোমার চাচাকে ওরা চেনে?'

'বছরখানেক আগে কাজে লাগানোর জন্য আমাকে দিয়ে গিয়েছিল। এখন আমিই চিনতে পারব না।'

'যদি জিজ্ঞেস করে আমি তোমাকে চিনলাম কী করে?'

ফেলুমামা বুদ্ধি করে বললেন, 'বলব, আপনার কথা এতদিন বলিনি। আপনি আমার আরেক চাচা। ওই চাচার ছোটভাই।'

লোকটি হাঁক দিয়ে ওপাশের দোকান থেকে চা-বিস্কুট আনিয়ে ফেলুমামাকে দিল, নিজেরাও খেল।

তারপর ফেলুমামার টোপ গিলল তারা।

লোকটি গলির বাইরে এসে রিকশা নিয়ে বলল, 'কোথায় যেতে হবে বলো!'

মামা বললেন, 'আপনার সঙ্গে যেখানে দেখা তার কিছুটা আগে।'

পথে যেতে যেতে মামা লোকটিকে অনেক দুঃখের কথা শোনালেন। বললেন, 'ওরা হয়তো সহজে আসতে দেবে না। আপনি কিন্তু ছাড়বেন না। আমার মন টিকছে না। কদিন আগে বাড়িতে মেহমান এসেছিল। আমি টেবিলে খাবার দিতে গিয়ে কয়েকটা প্লেট আর গ্লাস ভেঙে ফেলেছি। ওরা বলেছে, কুড়ি টাকা দাম। খুব মারধোরও করেছে। আমি বলেছি, আমার টাকা দিয়ে দিন আমি কাজ করব না। ওরা বলেছে, আগে নগদ কুড়ি টাকা আনো, তারপর তোমার সবকিছু পাবে। তোমার টাকা আটকে রেখে বড়লোক হতে চাই না। আসলে ওসব আটকে রাখারই ফন্দি!'

বাড়ির একটু দূরে থাকতেই ফেলুমামা বললেন, 'আমি তো এখন গিয়েই টাকা চাইব, কাজ ছেড়ে দেব। ওরা জানে কুড়ি টাকা দেবার ক্ষমতা আমার নাই, তাই আমাকে ছাড়বেও না।'

লোকটি পকেট থেকে দুটো দশটাকার নোট বের করে ফেলুমামার হাতে দিয়ে চোখ কটমট করে তাকাল তাঁর দিকে। বোঝাল, খবরদার, যদি মিথ্যে হয় তাহলে গিলে খাব!

লোকটা রিকশা থামিয়ে না-নেমে বলল 'আমি এখানে থাকি। কী বলে, সেটা আগে আমাকে এসে জানাবে। তারপর আমি যাব।'

মামা বাসায় ঢুকতেই সবাই হই হই করে উঠল : 'এত দেরি কেন? কী হয়েছে? বাজার কই?'

সময়টা এমনই যে বাড়িতে তেমন কেউ নেই। আর আশেপাশের মামার বন্ধুদের খবর দিতে গেলে সামনের দরজা দিয়েই যেতে হবে। লোকটা টের পেয়ে যাবে।

মামা শুধু ফিসফিস করে এটুকুই বললেন, 'একটা ছেলেধরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ধরতে হবে। তোমরা দাঁড়াও, আমি পল্টু-টল্টু যাকে পাই তাকেই ডেকে নিয়ে আসি।'

লোকটার চোখ এড়াবার জন্য তিনি পেছনদিককার পাঁচিলে উঠে পেছনের পথ দিয়ে তাঁর বন্ধু পল্টুকে ডাকতে যাচ্ছিলেন। তাঁর মা তখন ছিলেন ঘরের ভিতরে। তিনি কিছুই শোনেননি। জানেনও না। শুধু ফিসফাস শুনে বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ফেলু, অ-ফেলু। ফেলু এলি নাকি?'

অমনি ছোটদের কে-একজন দুই ঠোঁটে তর্জনী উঁচু করে তাঁর সামনে বলেছে: 'আস্তে। কথা বলবেন না! ছেলেধরা!'

অমনি তিনি ডুঁকরে কেঁদে উঠলেন : 'ও আমার ফেলুরে—কোন্ ছেলেধরা আমার সর্বনাশ করল রে—ও ফেলুরে—'

ওভাবেই তিনি কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যাচ্ছিলেন বাইরে দরজার দিকে। আর ঠিক সেসময় সবে পাঁচিলে উঠেছেন মামা। উঠে ঘোড়ায় চড়ার মতো দুদিকে দুই পা দিয়ে বসেছেন। হঠাৎ এই কান্না, 'ফেলুরে' 'ছেলেধরা' এইসব শোরগোল শুনে ধপ করে নেমে ছুটে গেলেন দরজার দিকে। ততক্ষণে সবাই দরজার তথা বাড়ির বাইরে।

মামা বাইরে বেরিয়েই দেখেন রিকশাটা তক্ষুনি বড় রাস্তায় উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মামা তীব্র বেগে ছুটে যাচ্ছিলেন তাঁর বন্ধুদের ডাকতে। রিকশাটা ধরতে হবে। কিন্তু ছুটতে গিয়েই তাঁর ডানায় টান পড়ল। তাঁর মা পুত্রকে দেখেই তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন। মামা বললেন, 'আরে, পরে পরে। এখন ছাড়ো!' বলেই ছুটলেন পাড়ার বন্ধুদের ডাকতে।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে!

দলবল নিয়ে সেই চায়ের দোকানের পেছনের ঘরে গিয়ে দেখেন চিড়িয়া উড়ে গেছে। কেউ নেই। চৌকিটা ছাড়া কিছু নেই!

বুড়ো দোকানদারকে জেরা করা হল, 'ছেলেধরা লোকগুলো গেল কোথায়?'

'ছেলেধরা, কাদের কথা বলছ বাবা?'

'ওই পেছনের ঘরে যারা তাস খেলছিল।'

'তা তো জানি না বাবাসকল। তবে মাঝে মাঝে কেউ কেউ ওখানে বসে তাস-টাস খেলে বলে শুনেছি। ঘরটায় দেখছি তালা লাগাতে হবে!' বলে বিরক্তির সঙ্গে লোকটি নিজের কাজে মন দিল।

হতাশ হয়ে ফেলুমামা সদলবলে ফিরে এলেন।

লোকগুলোকে পাওয়া গেল না, তাতে খুব একটা ক্ষতিও নেই।

কুড়িটা টাকা পাওয়া গেছে। দশটা টাকা ফেলুমামার মাছের-পটলের জন্য। আর বাকি দশটা টাকা ফেলুমামা সেই মিষ্টির দোকানে গিয়ে সেই ছেঁড়া টাকাটা বের করিয়ে সেটা বদল করতে চাইলেন। মিষ্টির দোকানের মালিক খুশি হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, ছেঁড়াটাই থাক। ওটুকুতে অসুবিধা হবে না। ব্যাংকে দিয়ে দেব।'

সুতরাং ফেলুমামা সেই দশটি টাকা দিয়ে বন্ধুদের নিয়ে, সেই দোকানেই ভোজোৎসব করে বীরদর্পে বাড়ি ফিরলেন।

তাঁর মা তাঁকে জাপটে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেললেন, 'ওরে আর তোকে বাজারে যেতে হবে না! আলুভর্তা দিয়ে ভাত খাব সেও ভালো।'

উপরের ঘটনাটা ফেলুমামার মুখেই শুনছিলাম। মামা তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়ার পর আমাদের উদ্দেশে বললেন, 'এবার দ্যাখ্, এই যে বয়েস-বয়েস করছিলি, বুদ্ধি থাকলে কমবয়েসেও কতবেশি বয়েসের খারাপ লোকদের ওপর টেক্কা মারা যায়। আমি ছোটবেলাতেই তার প্রমাণ রেখেছি।'

পান্তু জিজ্ঞেস করে ফেলল, 'মামা, আসলেই কি ওরা ছেলেধরা ছিল, নাকি সাধারণ কোনো দুষ্টবুদ্ধির লোক, মানে এই যেমন পকেটমার-টকেটমার...'

দীপু বাকিটুকু যোগ করল, 'অর্থাৎ প্রতারক-ট্রতারক। শুধু একটু টাকার লোভ ছাড়া...'

রাগে কিছুক্ষণ উত্তর দিতে পারলেন না মামা। একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'কার কাছে এতক্ষণ কী বললাম! একটু পরে হয়তো বলবি, ওরা ছিল নাবালক শিশু। আমিই ছেলেধরা। ওদের ধরতে গিয়েছিলাম!'

আমাদের মনে হল, ঘটনাটা ফেলুমামা সত্যিই বলুন আর বানিয়েই বলুন, যেভাবেই হোক, যদি তা ঘটে থাকে তাহলে তো ফেলুমামার শেষের কথাটি একেবারে মিথ্যে নয়!

সদাচার সমাচার

মাহবুব তালুকদার

ভজুদা শেষপর্যন্ত মামলা রুজু করলেন আমাদের বিরুদ্ধে। আমরা মানে 'সদাচার সদ্ব্যবহার সমিতির তিনজন সদস্য–ভোম্বা, লাড্ডু, আর আমি। অথচ ভজুদা কিনা আমাদেরই সমিতির সভাপতি। সমিতির গোড়াপত্তনের পর থেকে তিনি এর গোড়ায় পানি ঢেলেছেন অক্লান্ত অক্লেশে। কিন্তু আজ তাঁর গোঁড়ামির পরিচয় পাওয়া গেল। সামান্য একটা কারণে তিনি ছুটে গেলেন থানা অব্দি। যদিও থানার এপাশেই আমাদের আস্তানা এবং এ পর্যন্ত এসেই তিনি থামতে পারতেন। তা যদি হত, তবে বুঝতে পারতেন এ ব্যাপারে আমরা সবাই নির্দোষ। দোষ কারুর হয়ে থাকলে তবে সে হল বাংলা ব্যাকরণ। এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কিছুই ছিল না। বাংলা ব্যাকরণ সহজ হলে ঘটমান বিষয়টিও সহজতর হত। ব্যাকরণের দুর্বোধ্যতার ওপর রাগ না করে আমাদের অবোধ্যতার ওপর রাগ করা তাঁর উচিত হয়নি। থানায় যাওয়া মানায়নি তাঁর পক্ষে।

এই সেদিন পর্যন্ত ভজুদা আমাদেরকে কত ভালো ভালো নীতিবাক্য শিখিয়েছেন। 'সদা সত্য কথা বলিবে, রাগ করা মহাপাপ, কথা নয় কাজ, এক গালে চড় মারিলে অন্য গাল পাতিয়া দিবে, বিনয় অমূল্য ধন, পারিব না একথাটি বলিও না আর...'

ইত্যাদি। এগুলো মুখস্থ করতে করতে আমাদের মুখ ব্যথা হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত পরিণামে এই হল!

ঘটনা কেবল মামলা পর্যন্ত গড়ায়নি। লাড্ডুর মামা পর্যন্ত গড়িয়েছে। আর ওর মামা যে কী ভীষণ কড়া তা আমাদের অজানা নয়। তিনি কড়া ধোলাই দিয়েছেন লাড্ডুকে—রীতিমতো হামাগুড়ি দিইয়ে ছেড়েছেন। দুঃখ আমাদের সেখানেই যে কেসটা কোর্টে উঠবার আগেই লাড্ডুর শাস্তি হয়ে গেল। শাস্তি আইনত হলে আমরা অবশ্যই নতমস্তকে মেনে নিতাম। কিন্তু—

'বুঝলি প্যাঁচা!' আমাকে উদ্দেশ করে লাড্ডু বলল, 'আমি অনর্থক মামার মার খেলাম। ভজুদার কথামতো শিষ্ট ব্যবহার করতে গিয়েই আমার পৃষ্ঠদেশ—'

বলতে গিয়ে লাড্ডু প্রায় কেঁদে ফেলল।

'সে কী, ভালো কথা বলতে গিয়ে মার খেলি?'

লাড্ডু জামার কোনায় চোখ মুছে বলল, 'ভজুদার শেখানো কথাই তো বলতে গিয়েছিলাম আমি। মামা যখন প্রথম গালি দিলেন তখন আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'হে খোদা! মামাকে তুমি মাফ করে দাও। উনি কী করছেন, তা উনি জানেন না।'

'তারপর। তারপর?'

'তেড়ে এসে মামা আমার গালে কষে চড় লাগালেন। বললেন, 'হতভাগা পাজি কোথাকার! আমি কী করছি, আমি জানি নে? তবে তুই জেনে নে।' বলে আমার বাঁ গাল বরাবর আরেক চড়! বুঝলি ভোম্বা, ভজুদার কথা ভেবে আমি তৎক্ষণাৎ ডান গাল পেতে দিলাম। অমনি মামা দুগালেই চড়চাপ্পড় চালালেন। তোরা তো জানিস ভাই! রাগলে মামা আর মামা থাকেন না। একদম গামা হয়ে যান।'

আমরা সমস্বরে দুঃখ প্রকাশ করলাম এবং অকারণে চোখ মুছে লাড্ডুর প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে ছাড়লাম না।

'ভজুদার সঙ্গে থেকে আমার অবস্থা আরও সঙ্গিন হয়ে উঠেছে।' ভোম্বা নিজের পরিণতি বর্ণনা করল।

'তার মানে?' আমার ও লাড্ডুর চোখের দৃষ্টি রীতিমতো প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে গেল।

'আমাকে ভাই বাড়ি থেকে রাস্টিকেট করা হয়েছে।' বিরস বদনে ভোম্বা বলল।

'এ্যাঁ, বলিস কী! এ ধরনের কাজটি কে করলে?' আমি বললাম। রাজ-টিকে নেয়া আর রাস্টিকেট হওয়া আমাদের কাছে সমান ভয়াবহ।

'সবাই ভাই।' ভোম্বা সুদীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমার বোনের নতুন দেবরের সাথে ভজুদার শেখানো ভদ্রতা করতে গিয়েছিলাম। সে তো আমার ভদ্রতার লেং লেং.'

'...লেং খেল বুঝি?' লাড্ডু কথা ধরিয়ে দিল।

'না, না। লেং...মানে, লেংগুয়েজ শুনে রেগেমেগেই অস্থির। অথচ বাড়তি একটি কথাও আমি বলিনি, ভজুদার শেখানো ভদ্রতার কথা ছাড়া।'

'তা ভদ্রতার কথাটা কী?'

'অতি সাধারণ প্রথামাফিক কথা! বলেছিলাম, 'আপনার মতো ভদ্দরলোক আর একটাও দেখলাম না!'

আমার এহেন বিনয়সূচক কথা শুনে তার মেজাজ সুঁচোলো হয়ে উঠল, 'তার মানে আমাদের পরিবারের সবাই অভদ্র?'

'না না, সে কী কথা!' ভুলে বেয়াইকে আমি নানাই ডেকে ফেললাম। জিভ কেটে বললাম, 'আপনার বাবা অতি ভদ্দরলোক।'

'কী? আমার বাবা তুলে কথা!' তিনি উষ্মায় প্রায় ফেটে পড়ে বললেন, 'আবার জিভ বের করে ভেঙানো হচ্ছে!'

তার অগ্নিমূর্তি দেখে আমার বাক্যস্ফূর্তি হল না। ভজুদার শেখানো মুখের হাসি-হাসি ভাব করে মৃদুস্বরে আমি বললাম, 'আপনাদের বংশের সবাই ভদ্দরলোক।'

কী হতে কী হল, তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'আমাদের বংশ নিয়ে গালাগাল? বাঁশ দিচ্ছেন আমাকে দিন, আমাদের বংশকে দণ্ড দেয়ার কী মানে থাকতে পারে? আমি আর একদণ্ডও এখানে থাকছি না।'

আমার বোন এসব শুনে কেঁদেকেটে একাকার। বাবা চাচা অতিথির মান বাঁচাতে ছুটে এলেন। আমার ছোটভাই শোম্বা দশহাতি দড়ি নিয়ে গরু খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সে দড়ি হাতেই দৌড়ে এল আমাদের হয়ে নতুন বেয়াইয়ের হাতেপায়ে ধরার জন্যে। বেয়াই ভাই, তাকে বাঁধা হচ্ছে মনে করে কোঁচা বাগিয়ে চোঁচোঁ দৌড়। আর নতুন বোনাইয়ের পক্ষে এসব কথা শোনাই যথেষ্ট। তিনি বোনকে তালাক দিয়ে পাঠালেন। তা, লাকের কথা কে-ই বা বলতে পারে? আমাকেও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হল।'

ঘটনা বড়ই দুঃখজনক। আমি শোক প্রকাশ করলাম। কিন্তু ভজুদাই বা কেমন লোক দেখ দেখি! তাঁর 'সদাচার সদ্ব্যবহার সমিতি'র দীক্ষা নিয়েই না আমরা পদে পদে নিদারুণ শিক্ষা পাচ্ছি। তাঁর কাছেও আমরা কোনো কসুর করিনি। সামান্য একটি সন্ধি-বিচ্ছেদের পরিণতি হিসেবে আমাদের সবার বিচ্ছেদ হয়ে গেল!

এসব কথা ভেবে আর কী হবে? কপালে যা লেখা ছিল তা-ই হয়েছে। লাড্ডু আর ভোম্বা বলল, 'এসব থাক।'

'যাক!' বলে আমি চুপ করলাম।

ফুটনোট

আমাদের ঘটনা আপাতত এখানেই শেষ। পরে কী ঘটবে তা আল্লাহ্ বলতে পারেন। তবে গল্পের আরম্ভটা প্রারম্ভে করা উচিত ছিল। সেটা আগে করা হয়নি বলে

এখন লেজুড়ে জুড়ে দিচ্ছি। সরি! সহৃদয় পাঠকবৃন্দ! আমাদের পূর্বঘটনা অ-পূর্ব হওয়ায় কিছু মনে করবেন না।

দেশের দশের দুর্গতি দেখে দার্শনিক ভজুদার চিন্তার শেষ ছিল না। সমাজের চারদিকে কেবল নীতি-বহির্গত কাজ। ছাত্রের দল একছত্রও পড়ার দিকে মনোনিবেশ না করে থেটার দেখছে, লেটার লেখছে এবং সেটার খোঁজও কেউ রাখছে না। ন্যায়-সত্য-বিনয়-ভদ্রতা ইত্যাদি শব্দ অভিধান থেকে উঠেই যাচ্ছিল। ভজুদা তখন দর্শন পড়া নিয়ে ব্যস্ত। দর্শন থেকে হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আদর্শের পথে ছুটে এল। ভজুদা দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে 'হায় হায়' করে উঠলেন। আমরা, মানে ভোম্বা, লাড্ডু আর আমি তখন হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছি। ভবিষ্যৎ দূরে থাক, বর্তমান সম্পর্কেও আমাদের মনে কোনো দায়িত্ব বর্তায়নি। আসলে কোনোরকম টেন্সের সেন্স গ্রো করেনি আমাদের মনে।

ভজুদা এসে আমাদেরকে একসাথে বাঁধলেন। না, না, দড়ি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে এক হয়ে গেলাম আমরা।

একটা কামরা ভাড়া নিয়ে 'সদাচার সদ্ব্যবহার সমিতি'র অফিস করতেই পাড়াময় ফিসফিস শুরু হয়ে গেল। এতবড় একটা মহান কাজে কেউ কান দিল না! চারপাশে কেবল কানাকানি। অথচ 'সদাচার সদ্ব্যবহার সমিতি'র সদস্যসংখ্যা তিনজনের বেশি বাড়ল না পর্যন্ত। তার জন্যে আমাদের থোড়াই কেয়ার। গোড়াই যখন গলদহীন হয়েছে তখন আগার জন্যে ভাবনা নেই। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ভজুদাকে উৎসর্গ করে ইতিমধ্যে একটা কবিতাও লিখেছেন—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে'।

যাহোক, ভজুদা আমাদেরকে রীতিমতো নীতি-টিতি শেখাতে লাগলেন। কীভাবে ভদ্রতা করতে হবে, কেমন করে বিনয় করা যাবে—ইত্যাদি। ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমাদের অভিভাবকদল ভাবুক হয়ে উঠলেন। ভজুদার কথামতো আমরা যখন বাবা-দাদাদের সাথে বিনয় প্রকাশ শুরু করলাম, তখন গার্জেনদের সবাই খেপে তর্জনগর্জন শুরু করলেন। তাঁদের ধারণায় ভোম্বা লাড্ডু আর আমি পাকামি শিখছি। ঘরে-বাইরে আমাদের জীবন অসহনীয় হয়ে উঠল। কিন্তু দুনিয়ায় মহৎ কাজ করার জন্যে চাই ত্যাগ। আমরা সেকথা স্মরণ করে আমরণ জীবন উৎসর্গ করলাম। কিন্তু ভজুদাই যে আমাদের এমন করে ত্যাগ করবেন, তা কে জানত?

ঘটনাটি এমন কিছু নয়। বলতে গেলে, আমাদের ঘটে বুদ্ধির অভাব বলেই এরকমটি ঘটেছে। আর আমরা চিরকাল সমস্যা নিয়ে মাথাই ঘামিয়েছি, বুদ্ধি ঘামাইনি। ফলে ঘামে আমাদের বুদ্ধি সিদ্ধ হয়নি। হলে ব্যাকরণে আমাদের সিদ্ধি হতই।

হেলাফেলার কথা নয়, পহেলা থেকেই বলি। আমাদের সমিতির মটো—'সদাচার সদ্ব্যবহার করো' ভজুদাই ঠিক করে দিয়েছিলেন। বাক্যটা মুখস্থ করতে করতে আমরা মুখ ইস্তক পঁচিয়ে ফেলেছি। পরস্পরের দেখা হলে ওটাই ছিল আমাদের

প্রাইমারি সম্ভাষণ। প্রায়ই চিঠিপত্রের ওপর বাক্যটি আমরা ব্যবহার করতাম। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণের অনেক কিছুই আমাদের অজ্ঞাত ছিল তখন। বিশেষণ বিশেষ্যে বিশেষ যায় আসে না; কিন্তু সন্ধি-বিচ্ছেদে ভুল হলে রীতিমতো যুদ্ধের আশঙ্কা। আর অর্থই কেবল অনর্থের মূল নয়, শব্দার্থও অনর্থক অনর্থ বাধাতে পারে।

ভজুদা আমাদের নিয়ে যেরকম মেতে উঠেছিলেন, তাতে ভজুদার স্ত্রী, মানে আমাদের ভাবি যে বাপের বাড়ি চলে যাবেন, এ তো খুবই স্বাভাবিক। ভাবিকে নিয়ে ভজুদা ভাবিত হলেও প্রথমে খেয়াল ছিল না। ভাবি পিত্রালয়ে গিয়ে সাংঘাতিক আক্রমণাত্মক চিঠি লিখলেন। সে চিঠির শব্দাবলি ভজুদার ত্বক ভেদ করে হাড়ে গিয়ে বাজল। ভাবির অভাব ভজুদা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন। কিন্তু কী দিয়ে ভাবির মন গলানো যাবে ভজুদার তা অজানা নয়। ভজুদা জানতেন, ভাবিকে একটা বোতলভর্তি আচার পাঠালেই তার সব রাগ জল হয়ে যাবে। আচার পেলেই ভাবির জিভে জল আসবে এবং তাতে তার মুখ মূক হয়ে পড়বে।

অথচ সে-সময়ে আচার-চাটনি সংগ্রহ করা চাট্টিখানি কথা নয়। হাজার বাজার খুঁজেও আচার বার করা গেল না। আম, আমলকি, আমড়া, আনারস, আতা ও আপেল যে ছিল না তা নয়। কিন্তু তেলের অভাবে পাড়াপড়শীদের কেউ আচারের নামগন্ধও মুখে তোলেনি। কে কার পেছনে তেল খরচ করে এই ঘাটতি বাধাল কে জানে! যাক। অতি কষ্টেশিষ্টে ভজুদা একবোতল আচার সংগ্রহ করলেন। আচার ছাড়া তিনি যে একেবারে নাচার তা আমাদের জানার কথা নয়। ভজুদার আচার-রহস্য আমরা তিনজনের কেউই জানতাম না।

সেদিন সন্ধ্যায় সমিতির নীড়ে ফিরে দেখি আলমারির মাথায় একটা স্ফীতকায় বোতল অধিষ্ঠিত রয়েছে। আর টেবিলের ওপর আমাদের তিনজনের জন্যে ভজুদার একখানা চিঠি। চিঠিখানা নিম্নরূপ :

'সদাচার সদ্ব্যবহার করো'

প্রিয় ভোম্বা, লাড্ডু, প্যাঁচা,
আলমারির মাথায় একটি বোতল আছে।
উহার বিষয়ে সচেতন থাকিবে। বোতলের
ভিতরে হাত দিও না। আমি কিছুক্ষণ পরে
আসিতেছি।
আমার উপদেশ : 'কথা নয়, কাজ'।
'পারিব না একথাটি বলিও না আর'। মনে
রাখিও। ইতি—
ভজুদা।

চিঠির ভাষায় আমরা কিছুই বুঝলাম না। সব কথার অর্থ ভাসা-ভাসা মনে হল। বুঝলাম না বোতল সম্পর্কে ভজুদা কেন সচেতন থাকতে বলেছেন; কিংবা ওটার ভেতরে হাত দেয়া নিষিদ্ধকরণেরই বা কারণ কী! চিঠির শেষে প্রায়শই তিনি উপদেশ দেন বিধায় তা নতুন কিছু নয়। তবু চিঠি লেখার উদ্দেশ্য আমাদের মাথায় মাকড়সার জাল বিস্তার করল।

লাড্ডু বোতলটা টেবিলের ওপরে এনে রাখল। রঙিন বোতল। ভেতরে যেন কী দেখা যাচ্ছে। বোতলের গায়ে আঠা দিয়ে সাঁটা একটা কাগজে লেখা আমাদের সমিতির মূলমন্ত্র—'সদাচার সদ্ব্যবহার করো'।

কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছি। লাড্ডু বলল, 'বোতলের বন্ধ মুখ খুলে দেখা দরকার।' শুধু কথা নয়, লাড্ডু যথারীতি কাজ সমাধা করল।

'আরে! এ যে আচার মনে হচ্ছে।' আমি বললাম, 'ওটার ভেতরে খবরদার হাত দিস নে। ভজুদা ভেতরে হাত দিতে মানা করেছেন।'

'ইউরেকা! ইউরেকা!' ভোম্বা অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠল।

'কী!' বলতে গিয়ে আমার ও লাড্ডুর মুখে রা ফুটল না।

'সদাচার সদ্ব্যবহার করা'র অর্থ জানিস তোরা?'

'না তো!'

'তা জানবি কী করে?' ভোম্বা মুখ বাঁকিয়ে হাসল, 'ব্যাকরণ' না জানলে এই হয়! আরে হাবা! 'সদাচার'—সন্ধি-বিচ্ছেদ করলে গিয়ে দাঁড়ায় সদা আচার। আর কোনোকিছুরই সদ্ব্যবহার করার মানে হচ্ছে খাওয়া। তাহলে 'সদাচার সদ্ব্যবহার করো' কথার পুরো মানে হচ্ছে গিয়ে, সদা আচার খাও।'

'তাই তো! আমরা কেবল কথাই শিখেছি। তার মানেটা শিখিনি।' আমি বললাম।

'মানে শেখাও বড় কথা নয়,' লাড্ডু বলল, 'আসল হচ্ছে কাজ। ভজুদার উপদেশ, 'কথা নয় কাজ'। কী বলিস?'

'হ্যাঁ, হক কথা।' আমি সায় দিলাম, 'তবে বোতলের ভেতরে হাত দেয়া ঠিক হবে না। চামচ দিয়ে আচার বের করে খেলে হবে।'

সত্যি, ভজুদার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি আমরা। বোতলের ভেতরে হাত লাগাইনি। চামচ দিয়ে বোতল সাফ করেছি। চেটেপুটে চামচ পর্যন্ত ফুটফুটে করে ফেলেছি।

ভজুদা ফিরেছেন ঘণ্টাখানেক পরে। আমাদের মনটা তখন বেশ প্রফুল্ল। রসনাও পরিতৃপ্ত। কিন্তু ঘরে ঢুকেই ভজুদার চেহারা উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

'এ কী! আচারের পাত্র এখানে কেন?' ভজুদা দুচোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'আর একটু আগে এলে পারতে ভজুদা।' আমি উৎসাহের সাথে বললাম, 'পাতে যা ছিল সব শেষ হয়েছে। হাতও পরিষ্কার!'

রাগে দুঃখে ভজুদা বিনয় ভুলে গেলেন। তিরস্কার করে বললেন, 'আমার আচারের ভাণ্ড নিয়ে এই তোদের কাণ্ডকারখানা! এই তোদের আচার-বিচার? জানিস! আচার না পাঠালে তোদের ভাবি'.. —ভজুদার বাক্‌রোধ হয়ে এল।

আমরাও অবাক। ভোম্বা বলল, 'তুমিই তো বলেছ 'সদাচার সদ্ব্যবহার করো', মানে সর্বদা আচার খাও।'

'অ্যাঁ!' ভজুদা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'এত সাধ-সাধনা করে আমি তোদের এই শেখালাম! বোতলে হাত দিতে মানা করেছি না?'

'হাত দিইনি তো, চামচ দিয়েছি।' সবিনয়ে ভয়ে ভয়ে আমি বললাম!

'দাঁড়া! পাজি হতচ্ছাড়া কোথাকার'! ভজুদা আমাদের দিকে তেড়ে এলেন, 'আমাকে প্রাণে মেরে আবার বিনয় দেখানো হচ্ছে! লক্ষ্মীছাড়া!'

দাঁড়াবার মানে হয় না! তাড়া খেয়ে তাড়াতাড়ি আমরা বাড়ির পথে দৌড়! ভজুদা থামলেন না। তিনি এর বিহিত করতে আমাদের হিতের কথা ভুলে চললেন থানায়।

সেকথা আগেই বলেছি। আপনাদের জানাই আছে।

SEQA

কুড়ানো টাকার কুরুক্ষেত্র

ইমরুল চৌধুরী

কুড়ানো টাকা নিয়ে কুরুক্ষেত্র!

পুরো দশটা দিন দিশেহারা নারু কাণ্ডজ্ঞানহীন কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে বসে। জানামতো সকল চাতুরি খাটিয়ে চতুর নারু আমাকে ফতুর করে দেয়। যুক্তিযুক্তহীন যুক্তিতর্কে আমাকে ভড়কে দিতে চায়, 'দ্যাখ্ ইমু, মানিব্যাগটা কুড়িয়ে পাওয়ার সময় আমিও তোর সঙ্গে ছিলুম। পাওয়া টাকার পাওনা অংশ দিতেই হবে।'

বলে স্থিরসংকল্প নারু পাওয়া-টাকার আশায় পাওনাদার হবার ভান করে।

নারুর কচকচানি আমি তৎক্ষণাৎ নাকচ করে দিই, 'টাকাটা তুই কুড়িয়ে পাসনি। ফাঁকা রাস্তা থাকলেই টাকা কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। এর জন্যে বাঁকা চোখ থাকা চাই। টাকা পাওয়ার ব্যাপারে তোর কোনো অবদান আছে তা আমি স্বীকারই করি না।' আমি হক কথার মতো নারুকে সাফ সাফ জানিয়ে দিই। নারু তথাপি নিজের হক ছাড়তে রাজি হয় না। বরং হক কথার হকিকত শুনিয়ে আমার সাথে হঠকারী করতে চায়, 'তুই তো রোজই খালি হাত ফিরিস। আমি সঙ্গে ছিলুম বলেই তো মানিব্যাগটা তোর নজরে এল। আমিই তো তোকে মানির মাণিক্য দেখালুম।' বলে নারু চাণক্যের মতো আমার দিকে তাকায়। বাক্যবাণে আমাকে বাঁকা করতে চায়। বাক্যের চাকচিক্যে বাকায়দা ফায়দা ওঠাতে চায়।

আমি কায়দামতো নারুকে 'নো' করার চেষ্টা করি, 'তুই আমার সঙ্গে ছিলি ওটা নেহাত কোইন্সিডেন্ট। তুই আমার সঙ্গে না-থাকলেও সেদিন কালিচরণ রোডে মানিব্যাগের মাণিক্য ঠিকই চিকচিক করত। তুই ভেবেছিস ওই চাকচিক্য ছেড়ে আমি খালিহাতে হাততালি দিয়ে বাড়ি ফিরতাম। আর তুই কি কম বিট্রেই না করতে চেয়েছিলি আমার সঙ্গে। ছোঁ মেরে মানিব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে পুরো টাকাই তো আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলি। ঠিক সময়মতো পা দিয়ে তর্জনী চেপে না রাখলে পুরো টাকার মালিক তো তুই হতিস্।'

বলে আমি নারুর আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি। কিন্তু যেখানেই মানির প্রশ্ন সেখানে কোনো ক্ষীণ আশাও নিরাশ হতে দেয় না নারু। প্রয়োজনবোধে মুনি হতেও দ্বিধাবোধ করে না। মানির প্রশ্নে রক্তাক্ত হানাহানি ঘটাতেও তৎপর হয়ে ওঠে নারু। 'ফাও টাকার ফিফটিপার্সেন্ট তোকে দিতেই হবে ইমু।' রক্তচক্ষু নারু শক্তভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করে। ফিফটিপার্সেন্ট আদায় করার জন্য যেন শক্তভাবে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাপারটা মিটমাট করে নিজের ভাগ নিয়ে নারু ভেগে পড়তে চায়।

নারুর আচরণ আমাকে বিস্মিত করে। আমি যতই স্মিতমুখে জবাব দিই নারু যেন ততই আমাকে ভীত করে তুলতে চায়। যতই নির্ভয় হবার ভান করি ততই নারু ভয় দেখিয়ে আমাকে রীতিমতো পেরেশান করে তোলে। নারুর সকল চাতুরি প্রয়োগ সত্ত্বেও ওর ব্ল্যাকমেইলের মুখে টিকে থাকার চেষ্টা করি। একে একে ওর সকল প্রচেষ্টাই ফেল হতে থাকে।

'তার মানে পুরো টাকাটা তুই একাই আত্মসাৎ করবি!' নারু যেন শেষ কথা কথা জানতে চায়। আমিও সর্বশেষ কথা নারুকে জানিয়ে দিতে দেরি করিনে, 'তোর এখনও কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয় নারু। প্রয়োজন হলে বেমালুম তাই করব। পুরো টাকাটাই আমি দুহাতে দেদারভাবে উড়িয়ে ফুর্তি করে বেড়াব। এটা তোর অনেক আগেই মালুম হওয়া উচিত ছিল।'

বলতে বলতে নারুকে আমার শেষ কথাটা প্রচণ্ডভাবে মালুম করাবার চেষ্টা করি। নারুর মুখের সামনে বজ্রপাতের মতো দরজার খিল এঁটে খিলখিল করে উঠি।

'দূর হ' বলে দুরূহ নারুকে দূর হয়ে যেতে বলি। আর নারু রাগে দুহাত রগড়াতে থাকে। খিল-বন্ধ দরজায় প্রচণ্ড ঢিল মেরে সব লণ্ডভণ্ড করার জন্য যেন মারমুখো হয়ে ওঠে। তারস্বরে তারবার্তার মতো সংক্ষেপে খ্যাপা নারু তথাপি জানতে চায়, 'তাহলে এই তোর শেষ কথা ইমু!'

আমি দরজার খিল ধরে সেইরকম খিলখিলিয়ে উঠি, 'আর কথার বাড়াবাড়ি হওয়া উচিত নয় নারু। এখন তুই ভালোয় ভালোয় কেটে পড়তে পারিস।'

বন্ধ-দরজার ওপাশে রাগান্বিত নারুকে যেন সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই আমি। উপায়ান্তর না-দেখে যেন মন্ত্র-উচ্চারণের মতো নারু বলে যায়, 'আমি খেটে খাওয়া ছেলে ইমু। পাওয়া টাকায় আমার কোনো লোভ নেই। জেনে রাখিস কেবল

কুঁড়েলোকের জন্যই কুড়োনো টাকা। তুই কুড়িয়ে পেয়েছিস, আমি খেটে ওই টাকা আনব। এই টাকা তোর পেটে সইবে না ইমু বলে যাচ্ছি।'

বলতে বলতে নারু যাবার ভান করে।

আমিই আবার নারুকে থামাই। 'কোনো বদহজম হবে বলতে চাস? হ্যামবার্গার-চিকেন রোস্ট-ফ্রাইডপ্রন বদহজমের কিছু নেই নারু। নাহয় কয়েকটা ফ্রুটসল্ট লাগবে বড়জোর।'

বলে আমি জোর শব্দ তুলে নারুকে ফলস ঢেকুর শোনাই।

নারু শুনতে পায় কিনা জানি নে। তবে আমি স্পষ্ট শুনতে পাই নারুর জিভের চুকচুক শব্দ। রসনার রসে যেন আস্ত রসমালাই অনুভব করে নারু। নারুর সবটাই ফাও। ফাও টাকা। ফাও খাওয়া।

উল্টো নারুই আমাকে উপদেশ দেয়, 'ফাও টাকার ভোগ তোর হবে না ইমু। বরং ভোগান্তিই হবে বলে যাচ্ছি।'

বলে নারু যাবার জন্যে আবারও পা বাড়ায়। আমি নারুকে আবারও থামাই, 'তাহলে এও শুনে যা নারু, তুই সেদিন মাহবুব ক্লথ মার্কেটের ডবল নিটের যে জাপানি প্যান্টপিসটা দেখেছিলি আর সেদিন ফারাডাইস মার্টে লংকলার রেডস্ট্রাইপ শার্টটা দেখার পর থেকে তোর যেরকম হার্টবিট হচ্ছিল কাল থেকে আমাকে দেখা মাত্রই তোর সেই হার্টবিট মানে...'

বলে আমি সম্পূর্ণ কমা সারার আগেই নারুকে ওর হার্টফেল করার চেষ্টা করি। কিন্তু নারু উল্টো নিজের বুক দাপড়ে দাপট দেখায়--'কাল থেকে কার হার্ট কে বিট করবে তা তুই নিজেই টের পাবি নে ইমু।'

বলতে বলতে নারু একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। পাওয়া টাকা ছেড়ে ওর চলে যাওয়ায় খটকা লাগলেও আমি আপাতত নির্ভয়ে দরজা খুলে দিই। আপনমনে খোলা দরজার খোলা হাওয়া খাই। ভুলে যাই নারুও যে একজন অংশীদার। আমি কুড়ানো টাকার পুরোটা একাই ভোগ করতে গিয়ে ভোগান্তি বাড়িয়ে তুলি।

নারুর কথাই ঠিক। যেন ক্ষণিকের মধ্যেই অদৃশ্য নারুর অদৃশ্য হাতের কারসাজি দৃশ্যময় হয়ে ওঠে। পরের দিনই টের পাই। বন্ধ-দরজায় প্রচণ্ড শব্দে আমারই হার্টফেল হবার উপক্রম হয়। বন্ধ-দরজা যেন খোলার অপেক্ষায় থাকে না। যেন আপনাতেই খুলে যায়। আর অপরপ্রান্তের ষণ্ডা লোকের পাণ্ডা দেখে কাঁপুনি ধরে যায় আমার। শর্টহ্যান্ডের মতো শর্টকাটে কাজ সেরে ফেলতে চায়—মানে, মানিব্যাগ নিয়ে মানে মানে কেটে পড়তে চায়।

আমি বিনা বজ্রপাতে আকাশ থেকে পড়ি। কার মানিব্যাগ! আমি কিছুই না-জানার ভান করি। তাহলে কি নারু টাকা আদায় করার জন্য গুণ্ডা লাগিয়েছে। ভেবে আমার গণ্ডদেশ থেকে যেন ঘাম ঝরতে থাকে। হীন নারুর কার্যকলাপে আমার ঘেন্না ধরে যায়।

এদিকে ষণ্ডা লোকটা ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে ওঠে। পাওয়া টাকা নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে চায়। স্বীয় কথা বিশ্বাস করাতে গিয়ে আমাকে দ্বিগুণ বিস্মিত করে তোলে, 'আমি কি হাওয়া থেকে ব্যক্ত করছি। এই দেখুন না আজকের খবরের কাগজেই তো রয়েছে—' বলে সে বগলদাবা খবরের কাগজ সবলহাতে আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। আমি একদিকে বড় হাত করে তার দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিই, অপরদিকে আমার ভেতরটা আস্তে আস্তে জড় হয়ে যেতে থাকে। ত্বরিতে আমার হার্টবিট তড়াক করে বেড়ে যায়, যেন তড়িতাহতের মতো আমি শুধু হাত বাড়িয়েই থাকি নির্জীবের মতো। আড়ষ্ট জিভে আমি স্পষ্ট করে বলতে পারি না কিছুই।

কেবল বুঝতে পারি নারুরই দেয়া মরণপণ বিজ্ঞাপন এবং তাও নিজের নামে নয় অপরের নামে। নারু পরকে দিয়ে অপরের ধন আজ পরকেই দিতে চায়। বিজ্ঞাপন দেখে আমিও পণ করি। পাই পাই করে পাওনাদারদের পই পই জবাব দিই। কথার খই ছুটাই। মানে মানে সকলকে মানিয়ে অপরের মানিব্যাগ নিজের জেবে আগলে রাখি। পাওয়া টাকার পাওনা লোকদের ধাওয়া করে ফিরি। ধাওয়া করি আর দায় সারি। তাড়া করা লোকদের তাড়া খেয়েও তোড়া নোট হাতছাড়া করি না।

একসময় নারুও তাড়া করে, 'তার মানে তুই অন্যায়ভাবে টাকাটা ভোগ করবি। মানিব্যাগটা মেরে দিয়ে একট গর্হিত কাজ করবি।' বলতে বলতে নারু যেন আমাকে হিতোপদেশ দেয়। হিতে বিপরীতের মতো আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। নারুর অপকর্মের একটা বিহিত করতে চাই, 'তাই বলে তুই যার-তার নামে যা-তা একটা বিজ্ঞাপন দিবি। অবিবেকজনিত অবিজ্ঞ কাজ করবি।' নারু তথাপি বিজ্ঞলোকের মতো ভান করে, 'বিজ্ঞাপনটা নিশ্চয়ই বিফলে যায়নি। যার টাকা সে নিশ্চয়ই সন্ধান পেয়েছে।'

বলে আমাকে কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ করে তুলতে চায়। একটা পুলিশি কাণ্ডকারখানা না ঘটিয়ে নাকি আমি নিস্তার পাব না বলে নারু আমাকে সতর্ক করে। সবিস্তারে আমাকে ক্রিমিন্যাল অ্যাক্ট সম্পর্কে অবহিত করে নারু। আমাকে ভয় দেখায় এবং ভাবিয়ে তোলে।

তথাপি টাকার মায়াডোর আমাকে বিভোর করে রাখে। আমি সহজেই কুড়ানো মানিব্যাগের মায়া ছাড়তে পারি না। মানির মাণিক্য আমি কাঁকড়ার মতো আঁকড়ে থাকতে চাই।

নারু আমার ভাবসাব দেখে প্রীত হয় না। বরং হৃত টাকা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় আমাকে আরও ভীত করে তুলতে চায়, 'টাকার আসল মালিক কে তা তুই নিজেও জানিসনে ইমু। আসল মালিক তোর কাছ থেকে টাকা আদায় করে নেবেই। পাওয়া টাকা ভোগ করার আশা তুই এখনই ছেড়ে দে। নিজের সর্বনাশ তুই নিজেই ডেকে আনছিস ইমু।'

বলে নারু আমার সর্বনাশা পরিণতির ইঙ্গিত দেয়। আসল মালিককে টাকা না-দেয়া পর্যন্ত খবরের কাগজে নাকি বিজ্ঞাপন বেরুতেই থাকবে—এই বলে নারু

আমাকে সচেতন করতে চায়। আমার নাকি চেতনা ফেরা দরকার বলে নারু আমার চেতনায় আঘাত করতে চায়।

নারুর সদুপদেশ যেন আমার বিবেকে ঝড় তুলে দেয়। আমি সৎকাজে নিজেকে মনোনিবেশ করি এবং নারুকে শেষ কথা জানিয়ে দিই, 'দেখ নারু, পাওয়া টাকা দিয়ে বরং নেকি কাজ করা ভালো। পুরো টাকাটাই তারচেয়ে গেণ্ডারিয়া মসজিদে দান করে নেকি হাসিল করব।'

নারু আমার কথা শুনে ন্যাকা সাজার চেষ্টা করে। উদগ্রীব হয়ে উৎসাহ দেয়, 'তাই ভালো ইমু। সকলের নেকনজরে থাকার চেষ্টা কর্। অপরের টাকার ওপর যে লোভ দেখিয়েছিস তাতে তোর কৃতপাপের কোনো ক্ষোভ থাকবে না। তোর বরং প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার।'

মেকি নারু আমাকে উপদেশ দেয়। নেক কাজে দেরি করা উচিত নয় বলে নারু আমার নেকনজর থেকে উধাও হয়ে যায়। আমি সহজেই নারুর মেকআপ বুঝতে পারিনে।

তথাপি মেকি সিদ্ধান্তে অটল থাকি আমি। পাওয়া টাকা ও মেকি নারু—এ দুয়ের প্রাণান্তকর অবস্থা থেকে আমি আশু মুক্তি চাই। মুক্তি চাই গেণ্ডারিয়ার জামে মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে যার সফেদ শ্মশ্রু গুম্ফময় অলৌকিক মুখাবয়বের দিকে তাকিয়ে তুলে দিই কালিচরণ রোডে কুড়িয়ে পাওয়া কালো মানিব্যাগ। নেকি হাসিল করি এবং কপর্দকহীন শূন্যহাতে ঘরে ফিরেও পুণ্যি অর্জনের এক অলীক চেহারায় উদ্ভাসিত হই।

কিন্তু সেই অলীক উদ্ভাসিত চেহারা যেন ক্ষণিকের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। মেকি নারু ওর মেকআপ নিয়ে স্মিতমুখে খিলখিল করে ওঠে, 'ভালোই হল ইমু। তোরও নেকি হাসিল হল আমিও চরিতার্থ হলাম।'

আমি অর্থহীন সন্দিগ্ধ নারুর দিকে তাকাই, 'তাহলে কি...'

পুরো মানিব্যাগটা কেড়ে নেয়ার মতো নারু আমার মুখের কথাও কেড়ে নেয়, 'আসল মালিককেই শেষপর্যন্ত টাকাটা দিলি তবে...'

আমিও নারুর কথার গ্রাস কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করি। বিশ্বাস করি না নারুর কথায়, 'তবে কি ইমাম সাহেবই...।'

নারু যেন 'থাম্ থাম্' বলে চিৎকার করে ওঠে। পকেট থেকে কালিচরণ রোডের কুড়ানো কালো মানিব্যাগ বের করে রীতিমতো আমার ঘাম ছুটিয়ে দেয়, 'তুই আমাকে ইমাম সাহেব বললেও আমার আপত্তি নেই। প্রয়োজন হলে আমি ইমামতিও করতে পারি। হাঃ হাঃ ইমু, তুই যেন কী বলছিলি। হ্যামবার্গার ফ্রাইডপ্রন রেডস্ট্রাইপ লংকলার শার্ট।'

নারুর কথাগুলো আমার হার্টের ভেতর সূক্ষ্ম পিনের মতো চিনচিন করে বাজতে থাকে।

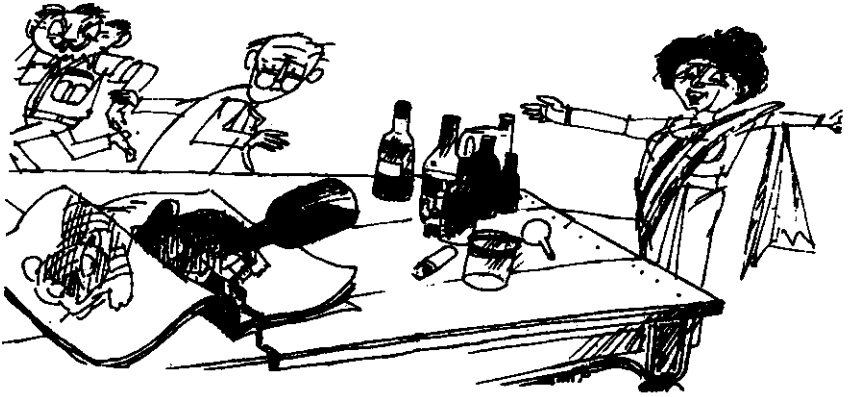

প্রফেসর বিভ্রাট ও ফটোজ্যান্তপ্রপঞ্চ

বিপ্লব দাশ

বিভ্রাট। শুধু বিভ্রাট নয়। প্রফেসর বিভ্রাট।

অমন নাম কারো হয় নাকি?

নাম শুনেই চিত্ত চিত্তির করে চিত্ত হুমড়ি খেয়ে পড়ে। নাকের ডগা থেকে খসে পড়ে মাছি। কারো কারো মাছির ডগা থেকে খসে পড়ে নাক। চোখে না দেখে শুধু নামেই ভড়কে যায় লোকে। কাছে ভিড়তে সাহস করে না। ভাবে : বাপ্‌রে! যার নামই বিভ্রাট, সে না জানি কী ভয়ংকর!

কিন্তু এমনটি তো হবার কথা নয়। যারা তাকে চেনে, তারাই জানে, 'তিনি বড় ভালো লোক'। ওই নামটাই গুবলেট করে ফেলে যত কিছু।

অনেকেই বলে আঁৎকানো নামখানা পাল্টাতে, বদলাতে। কিন্তু খানদানি নামখানা পাল্টাবদল করবেটা কে? কার ঘাড়ে মাথা কটা আর কার কত বুকের পাটা? চিনিপিসির দেয়া নাম বাতিল করে কোতল হতে চাইবে কে? অত সহজ কাজ নয়। চিনিপিসি পটল তুললেও পাল্টানো যাবে না ওই নাম। পৃথিবীজুড়ে কাগজে-পত্রে-বইয়ে-পুস্তকে-ফাইলে-সার্টিফিকেটে, এমনকি এনসাইক্লোপিডিয়ায়, হর-জায়গায় এই হ্যরিব্যল নাম। বিভু-র স্থলে বিভ্রাট। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর বিভ্রাট।

এর জন্যে দোষী, প্রফেসরেরই পিসি। চিনিপিসি। সামনে সাহস পায় না বলে আড়ালে অনেকেই পিসিকে নিয়ে ফিসফিস করে। বলে, অমন নামজাদা ভাইজাদাকে নামের ঘাই দিয়ে ঘায়েল করল ওই পিসিটাই। অথচ নিজের নামখানা দিব্যি মিষ্টি করে রেখেছেন : চিনি। গিয়ে দ্যাখ্ না বিশ্বাস না হলে, চিনিপিসির ঘরে কত পিঁপড়ে ঘুরঘুর করছে। আর ভাইজাদার ঘরে পিপঁড়ে তো দূর-কা-বাত, মানুষ পর্যন্ত এনট্রেন্স নিতে সেন্টেন্স ভুলে যায়, প্রবেশ করতে বেশ খুলে যায়। ড্রেসের কোনো অ্যাড্রেস থাকে না। অমন মিষ্টি যে চিনি, সেই চিনিপিসির কি এই উদ্ভট নামটা দেয়া ঠিক হয়েছে ভাইজাদাকে? (শাহজাদা যদি রাজার ছেলে হয়, ভাই-এর ছেলে ভাইজাদা হবে না কেন? ব্রাদারজাদাও হতে পারে)। চিনিপিসির কানে কি আর যায় না ওসব কথা? যায়। তিনি খেপে যান শুনেই। খেপে গিয়ে দম না ফেলে বেদম গাল দেন যাকে-তাকে। গাল শেষ হয়ে গাল ফুরোলে গাল ফুলিয়ে মহাশোরগোলে কাঁদেন।

যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই। মা'র পোড়ে না, পোড়ে মাসির। বিভ্রাট আমার ভাইয়ের পোলা, তারে আমি ল্যাজে কাটি আর মুড়ায় কাটি, তগো কীরে, 'পরের-ড্যাগে-খুঁত-ধরনি'রা—তগো কী? বিভুরে আমি বিভ্রাট বইলা আগেই ডাইকা ফালাইছি, নইলে তরাই তো ডাকতি একদিন। বিভুরে আমি কোলেপিঠে মানুষ করছি—লেখাইয়া পড়াইয়া জ্ঞানী করছি, তবে না আইজ বৈজ্ঞানিক হইছে? অখনো তরা অরে বিভু ডাকবার চাস? তগো 'আস্পর্দা'তো কম না রে! আমিই বলে পিসি হইয়া হ্যার কাণ্ডকীর্তি দেইখা বিভু ডাকনের সাহস পাই না, আর তরা ডাকবি বিভু? বাঁশবনে ডোম কানা নাকি আমি? বিভুর নাম বিভ্রাট থুইছি, ঠিকই করছি আমি। তরাই তো কস বলে যে, সবকিছুতেই প্রফেসর বিভ্রাট ঘটাইয়া ফালায়। বিভ্রাট যখন ঘটায়ই, তখন তার মর্যাদাটা দিবি না?' চোখের জলে চিনিপিসির চিনি গুলে শরবত হয়ে যায়।

এ সংসারে মন্দভালো সব কিসিমের লোকই আছে। সবার ভালো করার জন্যেই বিজ্ঞানচর্চা করে মস্তবড় বৈজ্ঞানিক হয়েছেন বিভু ওরফে চিনিপিসির বিভ্রাট। গবেষণাগারে নিত্যনতুন আবিষ্কারে আবিষ্কারে মত্ত এবং উন্মত্ত করে তুলেছেন দুনিয়া। এমন ধারা আজব আবিষ্কার প্রফেসরের আগে কে কবে করেছে? সব লিখতে গেলে এই গল্প, উপন্যাস হয়ে যাবে। উপন্যাসটাই আবার মহাকাব্য হয়ে যাবে। এত লেখা হবে বিভু ওরফে প্রফেসর বিভ্রাটকে নিয়ে যে বাংলাদেশের সব প্রেস ছাপাতে না পেরে প্রেসটিজ হারাবে একত্রে। ক্ষমতায় কুলোবে না কারো বিভ্রাটের অত কথা ছাপা। এটা তো গল্প, তাই অল্প একটু আবিষ্কারের ছোট্ট একটা কাণ্ডই লিখছি—রামায়ণের মতো সাতকাণ্ড করব না এখানে। ইচ্ছা করলেই শির থেকে পুচ্ছতক গুচ্ছ গুচ্ছ লিখে, রামায়ণের পাল্টা জবাব দেয়া যায় 'বিভ্রাটায়ন' দিয়ে। বিভ্রাট 'পা' আমার ঠিকই আছে কিন্তু আপাত স্থান ও কাল কম, অতএব কলমে লাগাম দিচ্ছি। স্রেফ ঘটনাটা এই :

যত ব্যাড-টিই হোক, ভোরে উঠে বেড-টি খাওয়া প্রফেসরের হামেশার অভ্যাস। সকালে উঠেই চায়ের চাহিদা। সারারাত গবেষণাগারে ভীষণ ভীষণ সব গবেষণা করে টাক গরম করে শেষরাতে একটা বকযন্ত্রের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে

পড়েছিলেন। কখন যে ঘুম নেমেছিল টের পাননি। ঘুম-তোড় বড়িটিও খেতে মনে নেই। ভুলো মনের বৈজ্ঞানিক তো, তাই! জেগে থাকার বিশেষ কোনো দরকার নেই তবু মাঝে মাঝে ভুলে জেগে থাকেন। আজ তেমনি ভুলে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ভেতর থেকে দরজা বন্ধ গবেষণাঘরের। বাইরে চা হাতে চিনিপিসি চেঁচাচ্ছেন। নকচাচ্ছেনও বলা যায়। দরজায় নক করতে করতে চেঁচাচ্ছেন যখন, তখন নকচাচ্ছেন বললে ক্ষতি কী? কড়া চা হাতে কড়া নাড়াচ্ছেন চিনিপিসি আর মরার মতন ভেতরে ঘুমোচ্ছেন প্রফেসর বিভ্রাট। কড়ায় মড়া নড়ে না—দরজার ফুটো দিয়ে চেয়ে দেখলেন পিসি।

ভোর হয়ে গেছে কখন। এখনো ঘুমোচ্ছে পড়ে পড়ে ওই গবেষণাগারের কলকব্জার মধ্যে ভাইপো তার। কড়া ছেড়ে কলিংবেলে কল করলেন পিসি।

ক্রি-রি-রি-রি-রি-রি-রি-রি-রিং।

ঘুম ভাঙল প্রফেসরের কলিংবেলের বিচ্ছিরি রি-রি-রি-রিতে। দরজা খুলে দিলেন। চা হাতে পিসিকে দেখে খুব খুশি। 'চা?'

'হ্য, চা।'

'বেড-টি তো?'

'হ্য, বেড-টি, নে ধর্।' কাপটি এগিয়ে দিলেন পিসি।

প্রফেসর ধরতে গিয়ে কী একটা ভেবে যেন ধরলেন না। বললেন, 'না পিসি, বেড-টিতে তো চলবে না এখন।'

পিসি তো অবাক! 'সকালে তো রোজই তুই বেড-টি খাস, —আইজ আবার তর কী হইল?'

'বেড-টি তো খাই বেডে—বিছানায়। আজ তো আমি টেবিলে ঘুমিয়েছি। টেবিল-টি করে আনো।'

ভাইপোর কথায় মেজাজ বিগড়ে গেল। 'টেবিলে ঘুমাইতে গেলি ক্যান্ তুই, অখন আমি টেবিল-টি পামু কই?'

প্রফেসর বিভ্রাট নিজের মাথা থেকে শ-তিনেক রকমের চা আবিষ্কার করেছেন—(সে গল্প ওকে নিয়ে লেখা উপন্যাসে পাবে) কিন্তু টেবিল-টি টা আবিষ্কার করা হয়নি। পিসি যেই বললেন 'অখন আমি টেবিল-টি পামু কই?'—অমনি ঝোঁক উঠল প্রফেসরের। বললেন—'ঠিক আছে—আজই আমি টেবিল-টি আবিষ্কার করব।' বলেই গবেষণাঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন পিসির মুখের ওপর।

পিসি আবার কলিংবেল টিপলেন।

আবার দরজা খুললেন প্রফেসার। আগে যে খুলেছিলেন সেকথা ভুলে গেছেন। বললেন, 'কী ব্যাপার পিসি, তুমি এত সকালে যে? রাতে ঘুম হয়েছিল তো?'

পিসি তার ভুলো-ভাইপোটিকে ভালোই চেনেন। বললেন—'তর ঘুম হইছে তো ঠিকমতো?'

'আমি কি আর ঘুমিয়েছি নাকি?'

'ঘুমাস নাই? ক্যান্? নতুন কিছু আবিষ্কার করছস নেকি?'

'হ্যাঁ। ফোটোলাইফফিনমিন্যান।'

'কী কস, বুঝি না—বাংলায় ক।'

'ফটোজ্যান্তপ্রপঞ্চ।' বলে পিসির দিকে তাকিয়ে হাসলেন প্রফেসার।

পিসির মুখে কিন্তু হাসি নেই। আবিষ্কারের নাম শুনে থতমত খেয়ে প্রফেসরের চায়ে নিজেই ভুলে চুমুক দিয়ে ফেললেন। 'কী জ্যান্তপঞ্চ কইলি তুই?'

'ফটোজ্যান্তপ্রপঞ্চ।' প্রফেসর পিসিকে বাতলালেন।

পিসি আরেক চুমুক দিলেন চায়ে। হ্যাঁ—আবিষ্কারের নামেই থতমত খেয়ে চা খাচ্ছেন তিনি বারবার। বেড-টি এখন থতমত-টি।

কাপের চা ফুরোতেই, চাপ দিলেন ভাইপোকে—'কই, দেখা দেখি তোর পঞ্চ ফঞ্চ না কী বানাইছস।'

'এখন না পিসি, পরে। আগে কর্নেল চিৎপাতকে একটা খবর পাঠাই। ও এলে, ওর সামনেই দেখাব।' বলে, চিনিপিসির হাতের খালি কাপটার দিকেই হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রফেসর বিভ্রাট। চিনিপিসিও ফাঁকা কাপই তুলে দিলেন ভাইপোর হাতে। ভাইপোরি মতো উনি এত ভুলো মনের নন, তবু কর্নেল চিৎপাতের নামে সব ভুলে গেলেন। কর্নেলকে বড় ডর তার। কারণ কী জানতে চাও? সে কারণ এ-গল্পে কুলাবে না। সেই মজার কাহিনী পরে হবে 'খন।

কর্নেল চিৎপাত সবে ঘুম থেকে উঠে সাড়ে সাতটা বুকডন দিয়ে, বাইশটা কাঁচা ছোলা খেয়ে, গোঁফের গোড়ায় ভোরের শিশির ছুঁইয়ে বাড়ির সামনের সারাটা রাস্তায় লেফট রাইট লেফট রাইট করে পায়চারি করতে করতে প্রফেসরের বাড়ির সামনে দিয়ে যেই যাচ্ছেন, অমনি বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে এলেন প্রফেসর নিজেই। হাতে একটা খাম।

'এই যে কর্নেল, এই যে তোমাকে একটা চিঠি লিখেছি, এই যে চিঠিটা। এই তোমাকে পেয়ে গেলাম এবং এই যে তোমাকে চিঠিটা দিলাম আর এই যে পেয়ে গেলে চিঠি। এখন আমি নিশ্চিন্ত। তুমি নিশ্চয়ই আজ সকালে আমার এখানে নাস্তা খেতে যে আসবেই, সে ব্যাপারে আর কোনো ভুল নেই। ভাবছিলাম পাড়ার কোনো ছেলের হাত দিয়ে পাঠাব তোমাকে চিঠিটা—তোমাকে যখন পেয়েই গেলাম তখন আর পাড়ার ছেলের দরকার কী? তুমিও তো একদিন পাড়ারই ছেলে ছিলে। এখন নাহয় বেপরোয়া হয়ে বেপাড়ায় থাকছ। তুমিই তোমার নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে যাও। বাড়ি গিয়ে চিঠি পড়ে জলদি চলে এসো—দেরি কোরো না যেন—আর কিন্তু সময় নেই। সাড়ে সাতটায় তোমার নিমন্ত্রণ। আমাদের সঙ্গে নাস্তা খাবে। জলদি বাড়ি যাও—চিঠি পড়ে জলদি চলে এসো। সাত মিনিট সময় মাত্র হাতে।'

গড়গড় করে বলেই প্রফেসর বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন। কর্নেলও গড়িমসি করলেন না। চিঠিটাকে নিরাপদে বাড়ি নেবার জন্যে ক্রলিং করে রওনা হলেন। বলা তো যায় না—শত্রু কোথায় ঘাপটি মেরে আছে—ছিনিয়ে নিতে পারে। হাজার হোক অতবড় একজন বৈজ্ঞানিকের লেটার। কনুই দিয়ে একমাইল পথ ক্রলিং করে বাড়ি ফিরলেন কর্নেল। রাস্তায় মাঠাওয়ালা ভাঁড় কাঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। ব্যাপারটা দেখে খুব ঘাবড়ে গিয়ে সে ভাঁড়-টাড় ফেলে চোঁ চোঁ দৌড়। যুদ্ধ! যুদ্ধ! চেঁচাতে চেঁচাতে একটা গলির মধ্যে সেঁধিয়ে গেল সে। ঘাবড়ে যাবার কথাই বটে। সাতসকালে সৈনিকের পোশাকে, তলোয়ার পিস্তল গুলতি দূরবীন ওয়াটারবটলসহ একটা তাগড়া মোটা গোঁফিয়াল লোককে ক্রলিং করতে দেখলে, কে না ঘাবড়ায়?

কারো ঘাবড়াবার তোয়াক্কা না করে কর্নেল চিৎপাত বাড়ি ফিরেই কোমর থেকে কোষবদ্ধ তলোয়ারটি খুললেন। কাজের ছেলে জুডোকে সামনে দাঁড় করিয়ে খাম ধরিয়ে দিলেন এক কোপ। জুডোর হাতেই খাম ছিল, জুডো ভয়ে ঘামছিল। তলোয়ার দেখেই ঘামছিল। কিন্তু যেই কোপটা মারা অমনি চিঠি দু ফাঁক। তলোয়ারের কোপে কিন্তু চিঠি দু ফাঁক হয়নি—ফাঁক হয়ে ছিঁড়ে গেছে জুডোর কাঁপাকাঁপিতেই। তাতেই কর্নেল খুশি।

কর্নেল চিঠি পড়লেন : 'ইতি—বন্ধু কর্নেল চিৎপাত। গতরাতে আমি দেশ ও দশের কাজে নতুন একটি জিনিস আবিষ্কার করেছি, যার নাম রেখেছি ফোটোলাইফফিনমিন্যান। আজ আমার আবিষ্কারটার প্রথম পরীক্ষা—তাই আমি খুব ব্যস্ত থাকব। এখন কেউ আমার বাড়ি এসে আমাকে ডিসটার্ব করুক সে আমি চাই না। তুমি সমঝদার লোক—তুমিই বুঝবে বেশি। তুমি আমার বন্ধু বলে হয়তো এসে আমাকে ডিসটার্ব করবে না, কিন্তু সবাই তো আর বন্ধু নয়—কেউ কেউ শত্রু। তুমিই তো শিখিয়েছ আমাকে ব্যাপারটা। তোমার কাছ থেকেই প্রথম জেনেছি যে, দেয়ালেরও কান আছে। সকলেই বন্ধু নয়, কেউ কেউ শত্রু। এখন আমি সতর্ক। সবসময় সতর্ক। কেউ এসে আমাকে আর ডিসটার্ব করতে পারবে না। আর লেখার সময় নেই—কারণ পাড়ার একটা ছেলেকে খুঁজতে বেরুব। ছেলেটা তোমার পাশের বাড়িতেই থাকে। তার হাতে তোমাকে লেখা এই চিঠিটা পৌঁছে দিতে হবে। সে গিয়ে তোমাকে দেবে। আমি নিজেই গিয়ে দিয়ে আসতে পারতাম তোমাকে। কিন্তু সময় কই? মাই ডিয়ার প্রফেসর বিভ্রাট।'

ইতি দিয়ে শুরু করে মাই ডিয়ারে চিঠি কি কখনো শেষ হয়? কর্নেল রাগ করলেন না, অতবড় বৈজ্ঞানিকের জন্যে তুচ্ছ এসব ছোটখাটো ভুল। এমন ভুলভাল না হলে আর কিসের বৈজ্ঞানিক! কিন্তু কর্নেলের রাগ না হলেও অভিমান হল খুব—এই বলল সাড়ে সাতটায় নিমন্ত্রণ আর নিমন্ত্রণপত্রে লিখেছে 'আজ আমার আবিষ্কারটার প্রথম পরীক্ষা—তাই আমি খুব ব্যস্ত থাকব। এখন কেউ আমার বাড়ি এসে আমাকে ডিসটার্ব করুক সে আমি চাই না।' এমনধারা নিমন্ত্রণপত্র কে কবে পেয়েছে? তা-ও ডাকে পাওয়া নয়, একেবারে নিমন্ত্রিতকে ডেকে হাতে তুলে দেওয়া! অভিমানে তলোয়ারটা খাপের ভেতর ভরে রাখতে ভুলে গেলেন। জুডো খোলা-তরবারির সামনে দাঁড়িয়ে তখনো কম্পমান।

'এই জুডো, কাঁপছিস কেন? আর কাঁপিস না—প্রফেসরের বাড়ি গিয়ে বলে আয় আমি নিমন্ত্রণে যেতে পারব না—পরে এসে কাঁপিস যত খুশি। বল্‌গে ওর মতো পাগলের দাওয়াত আমি গ্রহণ করি না।' কী যেন আবার ভাবলেন কর্নেল। বললেন, 'না থাক্, তোকে যেতে হবে না, আমিই গিয়ে বলে আসি যে আমি যেতে পারব না। এটাই ভদ্রতা! তুই বরং কাঁপ। আজকালকার ছেলে-ছোকরারা কাঁপতে ভুলে গেছে। তোর মধ্যে এই গুণটি দেখে ভালোই লাগছে।'

ঘড়ি দেখলেন কর্নেল।

সাড়ে সাতটা বাজতে এক মিনিট বাকি!

প্রফেসর টাইম দিয়েছে সাড়ে সাতটায়। এক মিনিটে অতটা পথ যাবে কী করে?

'জুডো গ্যারেজ থেকে জিপটা বের কর্ তো।'

জুডো কাঁপতে কাঁপতে জিপ বার করতে চলে গেলে কর্নেলের মনে হল জিপে গেলে দেরি হয়ে যাবে। জিপ বার করতে হবে, পাড়ার পোলাপান জোগাড় করতে হবে (গাড়ি ঠেলার জন্যে), পেট্রল পাম্পে যেতে হবে (পেট্রল ভরতে), ও পেছনের একটা একটা করে দুটো চাকা নেই, ব্যাংকে যেতে হবে (চাকা কেনার টাকা তুলতে), ব্যাংক থেকে আবার মোটর ম্যাকানিকসের কাছে,—তারপর গাড়ি সারিয়ে 'গাড়ি-ঠেলা' কমসে কম পঁচিশটা ছেলেকে যার যার বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। সবাই তো আর এক জায়গায় থাকে না। কেউ থাকে আজিমপুরে কেউ থাকে ফকিরাপুল কেউ মালিবাগ কেউ আরামবাগ কেউ ডেমরা কেউ সাভার—পালের গোদা যে ঠেলবে বেশি সে থাকে আরিচা। না, ফেরির ওপারে নয়, এপারেই। অতএব কর্নেল হিসেব করে দেখলেন এক মিনিটে কুলাবে না।

তিনি কুইক মার্চ করে ঘর থেকে বেরিয়ে জুডোকে ধরলেন। রাস্তায় গেটের সামনে এসে জুডোকে বললেন, 'জুডো তুই ওয়ান-টু-থ্রি বল তো।' জুড়ো বলল, 'স্যার আমি পুরাটা অখনো শিখি নাই। একশো পর্যন্ত বাংলায় গোনতে পারুম। গোনুম?' বলেই, এক দুই তিন করে একশো পর্যন্ত বলে যেই একশো এক বলেছে অমনি ধমক লাগালেন কর্নেল চিৎপাত। 'থাম্ ব্যাটা অশিক্ষিত ইলিটারেট!'

থেমে গেল জুডো। কাঁপা থামল না—কাঁপছে এখনো।

কর্নেল নিজেই 'ওয়ান-টু-থ্রি' বলে চোঁচোঁ ছুটলেন প্রফেসর বিভ্রাটের বাড়ির দিকে। হাতে খাপখোলা তলোয়ার নিয়ে পন্‌পন্ করে ছুটছেন কর্নেল চিৎপাত। ওঁর খোলা তলোয়ার নিয়ে ছোটা দেখে রাস্তার লোকজন প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারল দুদ্দাড় করে পালাল। বন্ধ হয়ে গেল দোকানপাট, বাজার-হাট। এক মাছঅলা কৈমাছের ঝাঁকা ফেলে 'বাপরে মারে কাইটা দু-ফালা কইরা ফালাইলো রে' করে চিল্লাতে চিল্লাতে পালিয়ে গেল। কৈ মাছরা সারা রাস্তায় স্বাধীনতা পেয়েছে ভেবে খুব খুশি, হঠাৎ দেখে তলোয়ার। হঠাৎ দেখে কর্নেল আসছে! কৈ-ও তো মানুষ, মাছ বলে তারা কি আর মানুষ নয়! ঝাঁকার কৈ পথে ছিল—এখন কর্নেলকে আসতে দেখে পথের কৈ কানকো দিয়ে যে যেদিকে পারে ছুটল। ওদের যে লিডার সে বুক ফুলিয়ে আগত কর্নেলের দিকে রাগত ভঙ্গিতে দাঁড়াল শিরদাঁড়া বাগিয়ে। কর্নেল আসতেই কর্নেলের বুটের ফিতেয় কানকো গেল জড়িয়ে। কর্নেল জানতে পারলেন না।

'এসে গেছি'—প্রফেসরের ঘরে ঢুকে ব্রেক কষলেন কর্নেল। কর্নেলকে তলোয়ার হাতে দৌড়ে ঘরে ঢুকতে দেখে চিনিপিসি চ্যাঁচামেচি করে কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন।

'মাইরা ফালাইলো রে—কাইটা দুইখান আলগা কইরা ফালাইলো রে—ওগো তোমরা কে কই আছ—আসো গো—বাঁচাও গো, আমাগো কাইটা বটি বটি কইরা ফালাইলো, কাইটা কুচি কুচি কইরা ফালাইল—আমাগো বাঁচাও গো, দেরি কইরো না গো—দেরি করলে আইয়া দেখবা ঘরে কেবল এক আগুল কিমা পইড়া রইছে—আমরা নাই। আমি আর আমার বিভ্রাট নাই। চিৎপাত ডাকাইতটা উদরপূর্তি কইরা আমাগো চপে ভইরা খাইয়া ফালাইব গো—ও—ও—ও...।'

কর্নেল ও প্রফেসর দুজনেই পিসির কান্নাকাটি ও চেঁচামেচির মধ্যেই হ্যান্ডশেক করে ফেলেছেন। কর্নেল ভুলে গেলেন কেন তিনি এসেছিলেন, প্রফেসর ভুলে

গেলেন কেন কর্নেল এসেছেন। অত চেঁচামেচিতে কারো কিছু মনে থাকা সম্ভবও নয়। পিসি তবু চেঁচিয়েই চলেছেন।

কর্নেলই পিসিকে বাধা দিতে চাইলেন।

'অ্যাই সুগারান্টি; হোয়াই আর ইউ ক্রাইং?'

চিনিপিসি কি ইংরেজি জানে নাকি? জানে না। তাই চেঁচানিতে আরো একটু পাঁচফোড়ন পড়ল ইংরেজি শুনে। কর্নেলও দমবার পাত্র নন। শুধালেন, 'ও জ্বি সুগারান্টি, তুম রোতা কিউ? মেরা সমঝমেত কুছ নেহি আতা—আগার তুম রোনা বন্দ নেহি করো গে তো, ম্যায় ভি রোনা শুরু ক্যরদেঙ্গা।'

ভিসিআর-এ হিন্দি ফিলিম দেখে দেখে পিসি দেঙ্গা ফেঙ্গা বুঝতে পারেন আজকাল। কান্না থেমে গেল মুহূর্তে। ডর ভয় সব গেল উবে—হ্যাঁ, হঠাৎ করেই।

'অই চিৎপটাং, (চিৎপাতকে তিনি চিৎপটাং বলেন) কোন্ ফিল্মের ডায়লগ রে?'

চিৎপাত এখন রিয়েলি চিৎপটাং।

'ডায়লগ?'

'হ জিগাই—তুই যে ডায়লগটা কইলি—সেইটা কোন্ সিনেমার ডায়লগ?'

'কী বলছ তুমি সুগারান্টি, কিসের ডায়লগ, কিসের সিনেমা?'

'আহা সিনেমা চিনছ না—কত নক্সাই জানস তুই? ছোটকালে লুকাইয়া লুকাইয়া মায়ের পয়সা চুরি কইরা সিনেমা দেখস নাই তুই! ভাবস আমি কিছু জানি না, না? তুই হেইদিন 'খুনপসিনা' ফিলিমটা ভিসিআরে দেইখা আইয়া হিস্টোরিটা কইছিলি—ভুইলা গেছস? আর অখন সিনেমা চিনস না। আমি কি কইছি, আমারে একটা দেখা! আমার বিভ্রাট থাকতে তর কাছে সিনেমা দেখতে চামু ক্যান? কোনো দিন চামু না। তর ভিসিআরটা চাইছিলাম একদিনের লেইগা—দিলি তো না। কনজুস, কিপ্টা, আহাম্মক, উজবুক, শয়তান, বদমাইশ, বান্দর, লাউয়ের ডগা, বাথথি পাউপা, গরু, গাধা, ছাগল, পঁচা বিলাই, মেকুরের শুঁটকি, ইন্দুর, বেঈমান...'

কর্নেলকে একধারসে গাল দিতে লাগলেন পিসি। আজ তার ডর নেই চিৎপটাংকে। থাউক হাতে তলোয়ার, মাজায় পিস্তল। থাউক মাথায় টুপি, পাওয়ে বুট, নাকের নিচে গোঁফ আর গোঁফের উপর নাক। আইজ আর ডর কিয়ের কর্নেলরে—মিথ্যুক কতবড়! কয় বলে ডায়লগ চেনে না, সিনেমা চেনে না!

প্রফেসর বিভ্রাট, পিসি ও চিৎপাতের কাণ্ডকারখানায় নেই।

পিসিই গালাগাল শেষ করে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, বিভ্রাট যেখান দাঁড়িয়েছিল সেখানে কেউ নেই। আছে যা, তা বিভ্রাট নয়। বিভ্রাটের চেয়েও বিভ্রান্তিকর জিনিস।

'বিভ্রাটরে তুই কই!' পিসি ককিয়ে উঠলেন।

কর্নেলও দেখলেন—কৈ! প্রফেসর কৈমাছ হয়ে গেছেন ভেবে কর্নেল তাকে তুলতে গেলেন হাত দিয়ে। কৈ কানকো দিয়ে মারল ছট্কা। বুটের কৈ বটে!

চিনিপিসিও চেষ্টা করলেন বারদুয়েক কিন্তু পারলেন না। বললেন, 'বিভ্রাটরে তুই হঠাৎ কৈমাছ হইলি ক্যান?' অখন আবার মানুষ হবি ক্যামনে। মাটির মধ্যে পইড়া উদাম গায় ছটফটাইতাছস—সর্দি লাগব যে রে! তবে অখন তুলি ক্যামনে টেবিলে? বিলে তো ছাড়তে পারি না ঘরের পোলারে।' ভাইপো ভেবে কৈ-কে খুব আদর

করছেন পিসি। 'তরে তুলি ক্যামনে? তুইলা না থুইলে তো বিলাইয়ে লইয়া যাইব। পাড়ার ব্যাকতে জবর ছোঁচা–তর মতো কৈ দেখলে ভাইজা খাইয়া ফালাইব।' বলতে বলতে পিসি বেরিয়ে চলে গেলেন রান্নাঘরে–চুলা থেকে একমুঠো ছাই নিলেন। বিভ্রাটের মাথায় ছাই দিয়ে বিভ্রাটকে তুলে তিনি জলের কলসিতে ভরে রাখবেন–বিভ্রাটের যখন ইচ্ছা হবে তখন নিজেই বিভ্রাট হয়ে যাবে।

ছাই নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলেন, কৈ নেই।

'আরে কৈ কই?'

কর্নেল তার ওয়াটার বটল দেখালেন।

'প্রফেসর ইজ ইন ওয়াটার বটল–ডোন্ট ওরি সুগারান্টি।' বাংলা করে বললেন আবার, 'চিন্তা কোরো না আন্টি, প্রফেসর আমার বোতলে ভালোই থাকবে–দুটো মুড়ি দাও তো, ওকে খেতে দিই। সকালের নাস্তা তো হয়নি এখনো।'

চিনিপিসি মুড়ির জন্যে ছুটলেন কিন্তু ফিরে এলেন মোয়া নিয়ে। মোয়া থেকেই ভেঙে ভেঙে মুড়ি ফেলতে লাগলেন জলের বোতলে। পিসি কর্নেল দুজনেই ঝুঁকে পড়ে দেখছেন তাদের বিভ্রাট মুড়ি খায় কিনা সাঁতরে সাঁতরে।

প্রফেসার, পিসি ও চিৎপাতকে সিনেমা নিয়ে কথা বলায় ব্যস্ত দেখে, তার তৈরি 'ফটোজ্যান্তপ্রপঞ্চে'র শিশিটা আনতে চলে গিয়েছিলেন গবেষণাগারে। গিয়ে দেখেন দু ইঞ্চি শিশি বেড়ে বোতল হয়ে গেছে। নিজের তৈরি আবিষ্কারে নিজেই তাজ্জব। শিশির শিশুত্ব ঘুচে বোতলত্ব এসেছে! খুশি হয়ে বোতল বগলে ফিরে এলেন খাবার ঘরে।

এসে দেখেন পিসি ও কর্নেল একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ে জলের বোতলে মুড়ি ফেলছেন।

'কী করছ তোমরা?'

পিসি ধমক দিলেন–'আহ্, চুপ কর্ তো, তোরে মুড়ি খাওয়াইতাছি, দ্যাখস না?'

'আমারে মুড়ি খাওয়াইতাছ–তার মানে আমাকে মুড়ি খাওয়াচ্ছ?' প্রফেসর ভ্যাবাচ্যাকা।

পিসির আবার ধমক–'মুড়ি খাওয়ামু না তো কি হরলিকস খাওয়ামু। কৈ মাছরে কি লোকে হরলিকস খাওয়ায়? যেমন কৈ হইছস তেমন মুড়ি খা। মানুষ হবি যখন তখন গরম গরম ভাত বাইরা দিমুনে।'

প্রফেসর কী আর করেন–তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। কর্নেলের কাঁধে ভর দিয়ে মৎস্যরূপী নিজেকে দেখার জন্যে ঝুঁকলেন।

কর্নেল বললেন–'আহ্, কাঁধে ভর দিয়ো না তো। কৈমাছ হয়ে সোলজারের সোলডারে ভর দেয়া ঠিক না।'

প্রফেসর তখন সোলজারের সোলডার ছেড়ে পিসির পিছু দাঁড়ালেন। পিছন থেকে পিসি ও কর্নেলের ঘাড় না ডিঙালে দেখা যাচ্ছে না ওয়াটারবটল। উঁকিঝুঁকি মারছেন। অমনি পিসিও খিঁচিয়ে উঠলেন, 'কী জ্বালাতন করতাছস তুই! মাছ হইয়া সাপের পাঁচ পাও দেখছস নেকি।'

'আমি কই মাছ হইলাম?' বাধ্য হয়েই বললেন প্রফেসার।

'আমরা কি না কইতাছি নেকি যে তুই কৈমাছ হস নাই।' পিসির তেড়ে ওঠা ত্বরিত জবাব।

'না—না', প্রফেসর বোঝাতে চায়—'আমি মাছ হলাম আবার কখন?'

'তুই মাছ না হইলে, মাছ হইল কে? বোকা পাইছস আমাগো? আমরা মুড়ি খাওয়াইতাছি কারে—দ্যাখ্ না নিজেই বোতলের ভিতরে চাইয়া—অখনো তো খলবল করতাছস।'

পিসির সঙ্গে তর্কে পারা মুশকিল। তবু বললেন—'কৈ মাছ যদি আমি, তবে আমি কে?' নিজেকে আঙুল তুলে দেখালেন।

'সত্যিই তো—তুই কে? আর এই কৈ কে?' পিসির টনক নড়ল।

কর্নেলও গম্ভীর মুখে ভুরু ও গোঁফ কুঁচকে মাথা নাড়লেন। —'তাই তো!'

প্রফেসর বললেন, 'কৈ নিশ্চয়ই কেউ—থাক্ ও কর্নেলের বোতলে। নিশ্চয়ই কেউ কৈয়ের ছদ্মবেশে আমার নতুন আবিষ্কারটা জানতে এসেছে। ও ব্যাটা স্পাই-কৈ সন্দেহ নেই।'

স্পাই-কৈ! কর্নেল সঙ্গে সঙ্গে বোতলের মুখ বন্ধ করে দিলেন। 'দিলাম ব্যাটাকে বন্দি করে। কী সাংঘাতিক স্পাই—কৈ হয়ে ঢুকে কী, কোথায়, কই, সব জেনে কৈলাশে পালাত। থাক এবার বন্দি হয়ে।'

কৈ-কে কয়েদ করে তিনজন খাবার-টেবিলে বসে গেল। প্রফেসর লেকচার ঝাড়বেন বলে মনে হল। কিন্তু লেকচার ঝাড়লেন না। বললেন, 'লেকচার দিয়ে বিজ্ঞানকে এগিয়ে নেয়া যায় না। আমিই যে 'ফটোজ্যান্তপ্রপঞ্চ' আবিষ্কার করেছি, সেই সাক্ষী হিসেবে কর্নেল তোমাকে ডাকা। আমি এই আবিষ্কারের হাতে হাতে ফল দেখাতে চাই। শুধু ফল নয়, ফল ফুল দই মিষ্টি, টফি চকোলেট সন্দেশ রসগোল্লা পানতোয়া আমিত্তি এমনকি ফুচকা চটপটি সব দেখাতে চাই। আমার এই আবিষ্কার আমার দেশের গরিবদের জন্য। যারা দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, তাদের জন্য।' প্রফেসর নিজের হাতের বোতলটা তুলে ধরলেন— 'এই দেখছ বোতল, এটা এক ঘণ্টা আগে শিশি ছিল—এর ভেতরের দ্রব্যগুণে এটি এক ঘণ্টায় বোতলে রূপান্তরিত হয়েছে। আর এক ঘণ্টা পরে হয়তো কলসি, এবং আরো এক ঘণ্টা পরে মটকি এবং এমনি করে করে একসময় পানির টাংকিতে পরিণত হবে। জানি তোমরা কেউ বিশ্বাস করছ না। কিন্তু আমার নাম প্রফেসার...' প্রফেসর নাম ভুলে গেলেন। পিসি খেই ধরিয়ে দিলেন—'বিভ্রাট'।

খেই পেলেন যেন প্রফেসার।

বললেন, 'হ্যাঁ, আমার নাম প্রফেসর বিভ্রাট—আমি জানি কার গোয়ালে কে দেয় ধুয়ো আর কত ধানে কত চাল আর কোন্ ছবিতে কত মাল।'

পিসি তাকাচ্ছেন কর্নেলের দিকে। কর্নেল তাকাচ্ছেন পিসির দিকে। প্রফেসরের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছেন না দুজন।

'পিসি, আমার লাইব্রেরি থেকে একটা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন নিয়ে এসো তো। ছবিওয়ালা ম্যাগাজিন আনবে। আমরা খাব।'

পিসি চেয়ার ছেড়ে উঠছিলেন ম্যাগাজিন আনতে কিন্তু থেমে গেলেন।

'এই সাত সকালে ম্যাগাজিন খাবি? কী কস তুই! ম্যাগাজিন খায় নাকি কেউ?'

'হ্যাঁ—আমরা ম্যাগাজিনই খাব—শুধু আমরা নয়, তুমিও খাবে।'

'না-রে বাবা—কাগজ খাইতে আমার ভালো লাগে না। বইয়ের পাতার থেইকা পানের পাতা খাইতে ভালো।'

'না না পিসি, আমরা বই খাব না, বইয়ের ফটো খাব। তুমি যাও তো, আর কথা বাড়িও না।'

চিনিপিসি চলে গেলেন।

এতক্ষণে কথা বললেন কর্নেল চিৎপাত : 'তুমি কি আমাকে ফটো খাওয়াবে নাকি নাস্তায়? ছবি-টবি খাওয়ার হবি কিন্তু আমার নেই। হজম করতে পারব না। ওসব বরং তুমি আর সুগারান্টি খাও—আমার জন্যে অন্য কিছু বলো।'

'ধৈর্য ধরো হে কর্নেল, ধৈর্য ধরো।' ফটোজ্যান্তপ্রপঞ্চর বোতলটা টেবিলে রাখতে রাখতে বললেন, 'ধৈর্য ধরো আর স্পাই কৈয়ের বোতলের মুখটা খুলে দাও—নিশ্বাস না নিয়ে মাছটা মরে যাবে। ওকে মেরে ফেলাটা মনুষ্যত্বের কাজ হবে না। বরং ওর ওপরই প্রথম পরীক্ষা করা যাক—যদিও আমার ফ-জ্যা-প্র-র কাজ ছবি নিয়ে, তবু জ্যান্ত-র ওপরেও পরীক্ষা করে দেখি রেজাল্ট কী দাঁড়ায়।'

কর্নেল তার জলের বোতলের ছিপি খুললেন এবং প্রফেসর তার প্রপঞ্চের বোতলের ছিপি খুললেন। প্রফেসর একফোঁটা ফ-জ্যা-প্র ঢেলে দিলেন মাছের জলে। জলের মাছেও বলা যায়। বারদুই খলবল করে থেমে গেল মাছটা।

একটা নয়, পিসি এদিকে একগাদা ম্যাগাজিন নিয়ে হাজির হলেন।

'অত পত্রিকা এনেছ কেন?' প্রফেসর বিরক্ত হলেন। 'অত দিয়ে কী হবে?'

'আনছি ঠিকই করছি—কর্নেলটা তো রাক্ষসের মতন খায়—অর কি আর দু-একটায় হইব। সবই খাইব ও। সকালে নাস্তায় তো অর চল্লিশটা পরোটাই লাগে।' পিসি টেবিলের ওপর রাখলেন ম্যাগাজিনগুলো।

'নো নো না না—আমি একটাও খাব না। কোন্ প্রেসে না-জানি ছাপা, তেল-কালির গন্ধ। ওসব খাব না।' কর্নেল উঠে পড়তে চাইলেন।

প্রফেসর বললেন, 'বসো, তোমাকে কাগজ খেতে হবে না। পিসিও বসো।'

পিসি ও কর্নেল বসলেন। প্রফেসর একটা ম্যাগাজিন রেখে বাকিগুলো একপাশে হটিয়ে রাখলেন। ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে একটা চকোলেটের বিজ্ঞাপন বার করলেন। বিজ্ঞাপনে গাদাগাদা রঙবেরঙের চকোলেট। ছবিটার ওপর বোতলের ফ-জ্যা-প্র ছিটিয়ে দিলেন।

ছিটিয়ে দিতেই সবার চক্ষু চড়কগাছ—খচমচ করে চকোলেটগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠল ফটো থেকে।

পিসি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। একটা চকোলেট মোড়ক থেকে খুলে গালে ফেলে দেখলেন সত্যিই সেগুলো চকোলেট। বললেন, 'সত্যিই তোরে বিভ্রাট!'

কর্নেলও নিলেন গোটা দশেক। মোড়ক খোলেন আর গালে ফেলেন।

প্রফেসর হেসে বললেন, 'আর কী খাবে তোমরা?'

পিসি ম্যাগাজিনটা কেড়ে নিয়ে যা দেখেন তাই খেতে চান। রসগোল্লা, কর্নফ্লেক, পটেটো-চিপস, মুরগির রোস্ট, আইসক্রিম, নানারকমের সালাদ—কত যে খেলেন

পিসি বেছে বেছে তার ইয়ত্তা নেই। একটি অডিকোলনের শিশি দেখে বড় ভালো লেগে গেল পিসির। বললেন, 'ওটা জ্যান্তপঞ্চ কইরা দেরে বিভু, খামু।'

প্রফেসর বললেন, 'ওকি খায় নাকি, তুমি বরং একটা সেন্টের শিশি নাও।' বলেই বিদেশি একটা দামি সেন্টের ছবির ওপর ছিটিয়ে দিলেন ফ-জ্যা-প্র কয়েক ফোঁটা। শিশিটা জ্যান্ত হয়ে উঠল। শিশি খুলে পিসি শুঁকলেন—আহ্ কী সুন্দর ঘ্রাণ!

কর্নেলও খেলেন নানান খাদ্য। দশরকমের কেক পেসট্রি, বিশ রকমের আইসক্রিম, আটটা গোটা খাশির রোস্ট, ষোলোটা হ্যামবার্গার, দুবোতল টমেটো সস। প্রসাধনীর মধ্যে বেছে নিলেন নামকরা কোম্পানির দামি আফটার শেভ লোশন। আর ভাতিঝিকে দেবার জন্যে একডজন লিপস্টিক। দু-কার্টন আবদুল্লাহ সিগারেট।

সারা টেবিলে খাবার ছড়ানো। হামলে পড়ে খাচ্ছে সবাই। প্রফেসারকে শাবাশি দিচ্ছে আর হালুম হুলুম করে খাচ্ছে।

পিসি বলছেন, 'বিভ্রাটরে, তর পিসি হইয়া জন্ম লইয়া আমার জীবন আর জিহ্বা দুই সার্থক হইলোরে। ভগবান করুক চাই না করুক আমি য্যান যুগে যুগে তর পিসি হইয়া জন্মাই।'

কর্নেল বলছেন, 'আমিও যেন তোমার বন্ধু হয়ে জন্মাই। না, যুগে যুগে না ডেলি ডেলি—এভরিডে।'

কথার মতো কথা চলছে, খাওয়ার মতো খাওয়া। হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ।

হঠাৎ!

হ্যাঁ, হঠাৎ-ই যেন বাজ পড়ল খাবার ঘরে। কর্নেলের ওয়াটার বটল ফেটে বেরিয়ে এল বিশাল এক কৈ মাছ। এক বিঘৎ মাপের মাছ এখন একফোঁটা ফ-জ্যা-প্র-তে আড়াই হাত। টেবিলে পড়ে লাফাতে লাগল কৈটা।

প্রফেসর চেয়ার উল্টে পড়ে গেলেন, কর্নেল চিৎপাতও চিৎপাত মাটিতে। পিসি 'বাবারে মারে' করে চেঁচিয়ে উঠলেন। দারুণ একটা হুটোপুটি পড়ে গেল ঘরে। ফ-জ্যা-প্র-র বোতল গেল উল্টে। তরল ফ-জ্যা-প্র গোটা টেবিলে ছড়িয়ে পড়ল।

একপাশে সরিয়ে রাখা ম্যাগাজিনের গাদার দিকে এগুতে লাগল তরল ফ-জ্যা-প্র। ভিজে গেল নিচের ম্যাগাজিনটা। ওটা ছিল ওয়াইল্ড লাইফের ম্যাগাজিন। দেশ-বিদেশের বন্য জন্তু-জানোয়ারের ছবিতে ভর্তি। প্রফেসর মাটি থেকে উঠবার আগেই ঘটে গেল কাণ্ডটা। ঘরের আসবাবপত্র লণ্ডভণ্ড করে বেরিয়ে এল এক গরিলা।

গরিলা বেরুতেই বিগড়ে গেল চিৎপাতের গলা—গরগর করে আওয়াজ বেরুতে লাগল গলা থেকে। 'গরিলা, গরিলা' করে চেঁচালেন চিৎপাত—কেউ শুনলে ভাববে গার্গল করছেন নুনপানি দিয়ে—একটু বাদেই হারমোনিয়াম টেনে সরগম করে গলা সাধবেন!

গরিলা বেরিয়েই তার খেলা দেখাল না। থমকে রইল থেমে। চিরকাল জঙ্গল দেখেছে—অমন হুটোপুটি লণ্ডভণ্ড করা তোলপেড়ে ডাইনিং রুম জীবনে দেখেনি সে। হতবাক হয়ে জুলজুল চোখে দাঁড়িয়ে রইল সে।

ওই অল্পসময়ের মধ্যেই বেরুল হাতি ঘোড়া ভাল্লুক সিংহ শজারু কুমির বাদুড় নেকড়ে শিম্পাঞ্জি অক্টোপাস কচ্ছপ হায়না শুয়োর হরিণ বাইসন অজগর বেবুন

ওরাংওটাং খরগোশ বেজি হাঁস চামচিকা প্যাঁচা উল্লুক হাড়গিলে মুরগি শকুন কাকাতুয়া টিয়া এবং প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসোরাস। শুধু তাই নয়, হিমালয়ের তুষারমানব ইয়েতি এবং ফিল্মের ইটিও এল বেরিয়ে।

'বাঁচাও বাঁচাও' করে পিসি চেঁচাচ্ছেন, কর্নেল চেঁচাচ্ছেন, প্রফেসর না-চেঁচিয়ে একজায়গায় দাঁড়িয়ে চোঁচা দৌড়ুচ্ছেন আর ডাকছেন—'পুলিশ! পুলিশ!' ম্যাগাজিনের একটা পাতায় পুলিশের ছবি ছিল—তাও আধখানা ছবি—গোটা পুলিশের বাম সাইড। বাঁ হাত, বাঁ পা, বাঁ কাঁধ, বাঁ চোখ, বাঁ কান, বাঁ মস্তক। অমন বেয়ো পুলিশ কী করতে পারে? সে শুধু একপায়ে দাঁড়িয়ে খ্যাকখ্যাক করে খাকি-মুখে হাসতে লাগল।

এদিকে হাতি আর ডাইনোসোরাসের ধাক্কায়, সজারুর জারিজুরিতে, ভালুকের Look-এ, বাঘের রাগে, সিংহের হিংসায়, বেবুনের বাবুয়ানিতে, অজগরের গজগজিতে, হায়নার বায়নায়, নেকড়ের কাড়াকাড়িতে প্রফেসরের বিভ্রাটভবন ধসে পড়ে ধ্বংসাবশেষ।

পরবর্তী দৃশ্য খুবই সাধারণ এবং স্বাভাবিক। চিনিপিসি পেছনে এবং তার আগে আগে প্রফেসর ও কর্নেল দৌড়চ্ছেন। জন্তু-জানোয়ার পাখি-কীট-পতঙ্গ তাদের ধেয়ে চলেছে। এদের সবার আগে লিড করছে কৈ মাছ। এখন আর এক বিঘৎ আড়াই বিঘৎ পৌনে দশ গজ নেই—এখন গজ অর্থাৎ হাতিকে ছাড়িয়ে গেছে সাইজে।

শহর থেকে লোক পালাচ্ছে পালে পালে। প্রতিরোধবাহিনী প্রতিরোধ করতে গিয়ে পাবলিকের গতিরোধে ব্যস্ত। বোমা কামান এন্টিএয়ারক্রাফট চালাচালি হচ্ছে। ফায়ারব্রিগেড ঘণ্টা বাজাচ্ছে মনের আনন্দে। রিকশা চুরমার। ট্যাক্সি, বাস, মাইক্রোবাসও চুরমার। প্রফেসরের ছয়টা চশমার একটা হারিয়ে গেছে। কর্নেলের তলোয়ারের খাপের খোঁজ নেই। চিনিপিসির পানের কৌটো কোথায় পড়ে গেছে। কারো কোনো হুঁশ নেই। পশু-পাখি জন্তু-জানোয়ার ঠেকাতে চেষ্টা করছেন শহরের সর্বস্তরের মানুষ, সর্বস্তরের প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক ম্যানেজার তার সাঙ্গোপাঙ্গসহ বস্তা বস্তা টাকা এনে ফেলছেন পশুমিছিলে—টাকা নাও তোমরা, টাকা নিয়ে ঢাকা থেকে গা ঢাকা দাও তোমরা। আর টাকা যদি ক্যাশে না নিতে চাও তো খুশির কথা। আমরা চেক লিখে দিচ্ছি। তোমাদের চেক করার জন্য চেকই উপযুক্ত। পশুরা কানেই তুলছে না সেসব কথা।

টিভি প্রযোজকেরা অনুরোধ করছেন—তোমরা আর ছুটোছুটি কোরো না, তোমাদের প্রত্যেককে টিভিতে প্রোগ্রাম দেব, চলে এসো। অডিশন, রিহার্সাল, কিছুই লাগবে না। তোমরা যা-খুশি করো।

পশুরা প্রযোজকদের পাত্তাই দিচ্ছে না। ছুটছে কেবল ছুটছে। মাথায় সূর্য গনগন করছে—প্রফেসরের টাক টনটন করছে।

হঠাৎ প্রফেসর ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন।

ওরা কেউ নেই—পশু-পাখি জন্তু-জানোয়ার কেউ নেই। পুরো মিছিলটাই নেই।

রাস্তার ওপর কতগুলো ছবি পড়ে আছে। রোদে পশুদের গায়ের ফ-জ্যা-প্র শুকিয়ে গেছে। এবার আবার ছবি হয়ে গেছে ওরা।

ব্যাংকের নোট আর পশু-পাখিদের ছবি মিলেমিশে তালগোল। সঙ্গে টিভির কনট্রাক্ট ফর্ম।

কর্নেল আর পিসিও প্রফেসরের পাশে ফিরে এলেন। তিনজনই কুড়োচ্ছেন।

প্রফেসর কুড়োচ্ছেন—পশু-পাখিদের ছবি।

পিসি কুড়োচ্ছেন—টিভির কনট্রাক্ট ফর্ম (তাঁর খুব ইচ্ছে টিভিতে অ্যাকটিং করার)। আর নিলডাউন হয়ে কর্নেল কুড়োচ্ছেন—নোট।

তার ইচ্ছেটা অন্য সবার মতো নয়।

তার ইচ্ছে প্রফেসরের ভাঙা বাড়িটা ওই টাকায় মেরামত করে দেবেন।

হাজার হোক পেয়ারের ইয়ার তো!

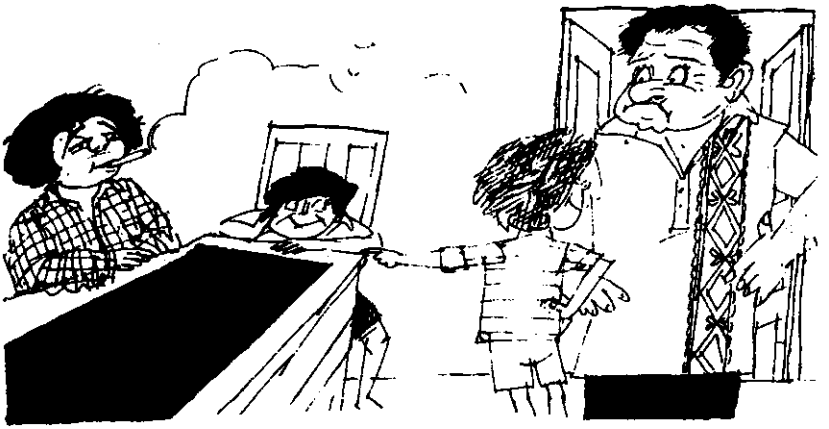

কেমন জব্দ

খান মোহাম্মদ ফারাবী

সেদিন বিকেলে ঝন্টুদের রোয়াকে বসে আমি, ঝন্টু আর খুরশীদ গল্প করছিলাম। এমন সময় নোটন এসে উপস্থিত হয়। এসেই বলল, 'আষাঢ়ে গল্প হচ্ছে বুঝি!'

ঝন্টু বলল, 'আষাঢ়ে গল্প করব কেন? আমরা করছি শ্রাবণী গল্প।'

আমি আরও একটু বিদ্যা জাহির করবার জন্য বললাম, 'আরে এ তো কার্তিক মাস। কার্তিক মাসে শ্রাবণী গল্প করে নাকি?'

খুরশীদ বলল, 'ঠিক বলেছিস। কার্তিক মাসে কার্তিকী গল্প বলাই ভালো। 'ক' দিয়ে যেসব লোকের নাম হয় তাদের গল্পই বল্।'

নোটন বলল, 'কায়েদে আযমের গল্প বল্।'

ঝন্টু ফস করে বলল, 'কায়েদে আযমের কথাও আমরা সবাই জানি। কালিদাসকে নিয়েই আরম্ভ কর্।'

খুরশীদ বলল, 'ধুর, তোদের ঐ কালিদাস টালিদাস বাদ দে। গল্প করলে কর্, আমাদের পাড়ার কামাল ভাইকে নিয়ে।'

আমি খুব ভার করে বললাম, 'নারে, কামাল ভাইয়ের কথা বলিস না। তার জন্য টাকাপয়সা পকেটে রাখার জোর নেই। পয়সা আছে টের পেলেই, যেমন করে হোক আমাদের ঠকিয়ে নিয়ে নেয়। সেবার আমার পাঁচটা টাকা কীভাবে মেরে দিল।'

নোটন বলল, 'দাঁড়া, কামাল ভাইকে জব্দ করতে হবে। কাল সকালে আসিস এখানে।'

পরদিন সকালে আমরা সকলে কামাল ভাইয়ের কাছে গেলাম। তাকে গিয়ে বললাম, 'কামাল ভাই, আমরা নাটক করব। তোমাকে একটা পার্ট নিতে হবে।'

কামাল ভাই প্রথমে রাজি হল না। তারপর অনেক পীড়াপীড়ি করার পর রাজি হল।

আমরা ঝন্টুদের বৈঠকখানায় গিয়ে রিহার্সাল আরম্ভ করলাম। কামাল ভাই করল অফিসের বড়বাবুর পার্ট। কামাল ভাই তখন বড়বাবুর মতো একটা জ্বলন্ত সিগারেট হাতে নিয়ে অভিনয় করছিল। ইত্যবসরে নোটন গিয়ে কামাল ভাইয়ের বড়ভাইকে ডেকে নিয়ে আসল। তিনি ঘরে এসে ঢুকতেই আমি দৌড়ে গিয়ে বললাম, 'দেখেছেন, কামাল ভাই সিগারেট খাচ্ছে।'

তার বড়ভাই তখন কামাল ভাইয়ের কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন। তাকে টেনে বাইরে নিয়ে যেতেই আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম। আমাদের সে কী হাসি! শুধু কি হাসি! হাসির সঙ্গে কাশিও। আমাদের মধ্যেই কে যেন খক্‌খক্ করে কেশে উঠল। আমি মনে মনে বললাম, বেশ জব্দ হয়েছে।

তারপর মাসখানেক ধরে কামাল ভাইকে আর পাড়ায় দেখতেই পেলাম না। তখন গ্রীষ্মের বন্ধ। কামাল ভাইয়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ সেদিন স্টেডিয়ামে কামাল ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। দেখেই বলল, 'জানিস ফোক্‌লা, আগামী রোববার আমার বড়মামার মেয়ের বিয়ে। তারা সিলেট থাকে। আমাকে যেতে বলেছে। একা একা যেতে ভালো লাগে না। তাই তোকে নিয়ে যাব। ঝন্টুকেও বলেছি। সে যেতে রাজি হয়েছে। শুধু বিয়েই নয়, বিয়ের পরও কিছুদিন থাকব। সেখানকার পাহাড়-টাহাড় দেখে, অন্যান্য জায়গায় ঘুরে তারপর আসব।'

আমি তবুও নিঃসন্দেহ হতে পারলাম না। কামাল ভাই যদি মিথ্যে বলে থাকে! তাই বললাম, 'বিয়ের কার্ডটা দেখাও।'

কামাল ভাই পকেট থেকে দলানো মোচড়ানো একটা কার্ড বের করল। কামাল ভাইয়ের মামার নাম তো আমি জানিনে। তাই কার্ডের ওপর একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে, যাব।'

আমি বেশ খুশি হলাম। যাহোক গ্রীষ্মের বন্ধটা তো কাটানো যাবে।

পরদিনই রওনা হলাম। আমি, কামাল ভাই আর ঝন্টু। স্টেশনে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত পৌনে নটা। আর দশ মিনিট পরেই গাড়ি আসবে। কামাল ভাইয়েরই আমাদের গাড়িভাড়া দেওয়ার কথা। তাই কামাল ভাইকে বললাম, 'কামাল ভাই, টিকিটটা করে ফ্যালো।'

কামাল ভাই বলল, 'তাড়াহুড়ো করে আসার সময়, ভুলে গাড়ি ভাড়ার টাকাই আনিনি। এখন আমার কাছে একটা পয়সাও নেই। আমার ভাড়াটাও তোরা এখন দিয়ে দে। পরে তোদের টাকা ফেরত দিয়ে দেব।'

আমার কাছে ছিল বিশটি টাকা। আর ঝন্টুর কাছে ত্রিশ। আমরা তখন বাধ্য হয়ে কামাল ভাইয়ের ভাড়াও দিলাম।

সিলেট গিয়ে পৌঁছলাম বেলা প্রায় আটটার সময়। স্টেশন থেকে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ হাঁটার পর কামাল ভাই একটা বড় বাড়ি দেখিয়ে বলল : ঐটে হল আমার মামার বাড়ি।

আমি বললাম, 'আরে, আরে, ওটা তো একটা হোটেল।'

কামাল ভাই বলল, 'হ্যাঁ আমার মামার একটা হোটেল আছে। নিচের তলায় হোটেল, আর ওপরের তলায় মামা পরিবারসহ থাকেন।'

আমি বললাম, 'আগে তো একথা বলোনি?'

কামাল ভাই বলল, 'আগে একথা মনে ছিল না। আর হোটেলটা তো নতুন খুলেছে।'

আমরা হোটেল বাড়িটার একতলার সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। কামাল ভাই উপরে উঠে গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল। এসে বলল, 'চল্, ওপরে চল্।'

আমরা উপরে উঠে গেলাম। গিয়ে সিঁড়ির সামনে এমন একটা মূর্তিকে দেখলাম যে, চমকে উঠে সিঁড়ি থেকে ধুপ করে পড়ে গেলাম। না, ঠিক পড়ে গেলাম নয়। পড়ার আগেই ঝন্টু এসে আমাকে ক্রিকেটবলের মতো টুপ করে ধরে ফেলল। বাউন্ডারি পার হতে দিল না। সিঁড়ির সামনের মূর্তিটাকেই কামাল ভাইয়ের মামা মনে হল। ইয়া লম্বা চওড়া মানুষ। তুমি যদি এক হাত দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলো, তাহলে ঠিক তার ভুঁড়িটার সঙ্গে তোমার দেহের একটা কলিশন হয়ে যাবে। এহেন মূর্তির সঙ্গে কথা বলার আর সাহস হল না। কামাল ভাই-ই গিয়ে তাঁর সঙ্গে কী-সব কথা বলল। তারপর আমাদের একটা ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। সেখানে বিছানা পাতাই ছিল। আমরা গিয়ে গা এলিয়ে দিলাম।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বিকেল চারটা। কিন্তু আমাদের ঘরে কামাল ভাইকে দেখতে পেলাম না। ভাবলাম, বোধহয় কামাল ভাই একটু আগে ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধোয়ার জন্য বাইরে গিয়েছে। হঠাৎ নজর পড়ল টেবিলের দিকে। সেখানে তিন প্লেট খাবার ঢাকা রয়েছে। ঢাকনাগুলো খুলে দেখি প্লেটের খাবারগুলো কে যেন খেয়ে রেখেছে। আমাদের আর বুঝতে বাকি রইল না এটা কার কর্ম। এমন সময় কামাল ভাই এসে ঘরে ঢুকল। তাকে দেখেই আমি চটেমটে বলে উঠলাম, 'ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনা নাকি? আমাদের খাবার খেয়েছ কেন?'

কামাল ভাই বলল, 'কী করব বল্? ঘুম থেকে উঠেই এতগুলো খাবার জিনিসের লোভ সামলাতে পারলাম না। তাই খেয়ে নিলাম। আর এতেও তোদেরই লাভ হয়েছে। কালই বিয়ে। আজ দুবেলা অনশন করলে কাল খেতে সুবিধে হবে।'

আমি বললাম, 'তোমারও তো অনশন করা দরকার। তা না হলে তুমি কী করে খাবে কাল?'

কামাল ভাই বলল, 'আমার খাওয়ার জন্য চিন্তা করিস না। আমার মামার বাড়িতে যখন বেড়াতে এসেছিস তখন তোদের খাওয়াটার দিকেই তো লক্ষ্য রাখতে হবে। নইলে ঢাকায় গিয়ে ছেলেদের কাছে আমার মামার বাড়ির বদনাম করবি। তাই আমি নিজে বিয়ের খাওয়ার জন্য প্রস্তুত না হয়ে তোদেরই প্রস্তুত করছি।'

আমরা ভাবলাম ঠিকই তো। কামাল ভাই আমাদের জন্য কত ভাবছে। তাই আর এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করলাম না।

রোববার। আজ বিয়ের দিন, কিন্তু বিয়ের কোনো আয়োজনই দেখলাম না। রোজ যেরকম থাকে, আজও সেরকমই আছে। বিয়েবাড়িতে তেমন লোকজনও গমগম করছে না। বাড়িটাও সাজানো হয়নি। আমি অধৈর্য হয়ে বললাম : 'তোমার মামাত বোনের বিয়ে তো আজকেই। কিন্তু বিয়ের তো কোনো লক্ষণ দেখছি না। তাছাড়া, তোমার মামি বা তোমার মামাতো বোনকেও তো আজ পর্যন্ত দেখলাম না।'

কামাল ভাই মাথা নেড়ে বলল : 'মামার মেয়ের বিয়ের তারিখ তো পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। আর মামি আর মামাত বোন কুমিল্লায় তার খালাম্মার কাছে বেড়াতে গেছে।'

'এ্যাঁ, তাহলে বিয়েটিয়ে কিচ্ছু হবে না!'

'আমি কী করব বল্? বিয়ের তারিখ যখন পিছিয়ে দিয়েছে তখন আমি তো আর কিছু করতে পারি না।'

'তাহলে আমাদের এসে লাভ?'

'বিয়ে না হওয়াতে কী আছে? এখানকার পাহাড়-টাহাড় তো দেখে যেতে পারবি। কাল চল্ আমরা পাহাড়ে গিয়ে পিকনিক করি।'

আমি আর তখন কী করব। ভাবলাম বিয়েটা নাহয় নাই হল, তবু যদি পাহাড়ে-টাহাড়ে বেড়ানো যায়, সেটা তবু মন্দের ভালো। আমি তো তখন রাজি হয়ে গেলাম।

পরদিন আমরা সকলে পাহাড়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম। কামাল ভাই বলল, 'ট্যাক্সিতে যাবি না রিকশাতে যাবি?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন তোমার মামারই তো গাড়ি আছে।'

কামাল ভাই বলল, 'সেটা আমরা আসার কদিন আগে এ্যাক্সিডেন্ট হয়ে একেবারে ভেঙে গেছে। এখন তো ট্যাক্সি বা রিকশাতে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। অবশ্য ভাড়াটা আমিই দেব।'

আমি বললাম, 'তবে ট্যাক্সিতেই চল্।'

আমরা ট্যাক্সিতে চড়ে পাহাড়ে গেলাম। সেখানে ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া দেবার সময় কামাল ভাই চিৎকার করে উঠল, 'এ্যাঁ মামার কাছ থেকে চেয়ে নেয়া আমার সব টাকা যে হারিয়ে গেছে। আমার পকেট ছেঁড়া।'

আমরা দেখলাম সত্যিই তো কামাল ভাইয়ের পকেটটা ছেঁড়া। আমি আমার শেষ সম্বল পাঁচটি টাকা দিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া চুকিয়ে দিলাম। ফিরবার পথে ঝন্টুও তার শেষ

সম্বল দিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিল। এর পরদিনই আমরা ঢাকা জেলায় ফেরবার জন্য প্রস্তুত হলাম। স্টেশনে যাবার ঘণ্টাখানেক আগে কামাল ভাই বলল : 'আমি গিয়ে টিকিট কেটে রাখি, তোরা একঘণ্টা পরে কাপড়চোপড় গুছিয়ে আসিস।' আমরা যখন একঘণ্টা পর বাড়ি থেকে বেরুবার উপক্রম করছি তখন কামাল ভাইয়ের মামা এসে তাঁর ভুঁড়ি দিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। বললেন : 'কোথায় যাচ্ছেন সাহেব, হোটেলের ভাড়া চুকিয়ে যান।'

আমরা যেন আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম, 'সে কী সাহেব, আমরা তো কামাল ভাইয়ের মামার বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে এসেছিলাম। তার আর ভাড়া কিসের?'

'কে বলল মামার বাড়ি? এটা কারো মামাবাড়ি নয়, বুঝলে? যদি ভাড়া না দাও, তবে দাদার বাড়ি দেখিয়ে ছাড়ব।'

আমি চমকে উঠলাম। ঝন্টু ফিসফিস করে বলল, 'দাদার বাড়ি মানে? হাজত।'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'তবে যে কামাল ভাই বলেছিল...'

'বাদ দাও তোমার কামাল ভাইয়ের কথা। সে বেটাই তো একটু আগে বলল যে, হোটেলে যে ছোকরাদুটো আছে, তাদের কাছ থেকেই হোটেলের ভাড়াটা নিয়ে নিও। তোমরা যদি হোটেল ভাড়া না দিতে পারো তবে তোমাদের কাপড়ভর্তি ব্যাগদুটো আমি নিয়ে যাব।'

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হোটেলওয়ালা এসে বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে আমাদের ব্যাগদুটো বাজেয়াপ্ত করে নিল এবং একটা ঘরের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি চুপ করে বসে পড়লাম মাটিতেই। আমার ব্যাগটা ছিল বড়ভাইয়ের। অনেক বলে কয়ে এনেছিলাম। এখন যদি সেই ব্যাগটা ফেরত নিয়ে না যেতে পারি, তবে আমার অবস্থা যে কী হবে, বড়ভাইয়ের জ্বলন্ত চোখদুটো মনে পড়তেই আঁৎকে উঠলাম।

ঝন্টু বলল, 'তাড়াতাড়ি চল্, নাহয় গাড়ি ফেল করব।'

তাড়াতাড়ি স্টেশনে পৌঁছে দেখি গাড়ি এসে গেছে। আর কামাল ভাই দুটো টিকেট কিনে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের কোনোকিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই বলল, 'চল্, চল্ গাড়ি এসে গেছে।' তারপরই গাড়ির দিকে ছুটতে আরম্ভ করল। আমরা যখন গাড়িতে গিয়ে উঠলাম তখন কামাল ভাই বলল, 'আমি পরের ট্রেনে যাচ্ছি। তোরা এখন যা।'

তারপর হেসে বলল, 'হোটেলটা যে মামার নয়, বুঝতেই পারছিস। আর বিয়ের কার্ডটাও যে অন্য একটা বিয়ের তাও বুঝতে পারছিস নিশ্চয়। আমাকে সেদিন তোরা বড়ভাইয়ের হাতে যে মার খাইয়েছিলি, এটা তার প্রতিশোধ।' ততক্ষণে গাড়ি চলতে শুরু করেছে। প্লাটফর্মের দিকে চেয়ে দেখলাম যে তখনো কামাল ভাই

চেঁচিয়ে বলছে, 'তোদের গাড়িভাড়ার টাকার জন্য আমি তোর ঝর্না কলমটা নিয়ে নিয়েছি।'

বুকপকেটের দিকে চেয়ে দেখলাম, কলমটা সেখানে নেই। কোন্ ফাঁকে যেন কামাল ভাই সেটিও নিয়ে নিয়েছে।

এবার নিজেকেই বলতে ইচ্ছে হল : কেমন জব্দ!

উন্নয়ন
সাহিত্য
AEP

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি **'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র**
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

সেকায়েপ

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (SEQAEP) এর
পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত।
বিক্রির জন্য নয়